ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** জহ্নু দাস ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৪ তম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ বিষ্ণু ৫৩৪ ■ মার্চ ২০২০

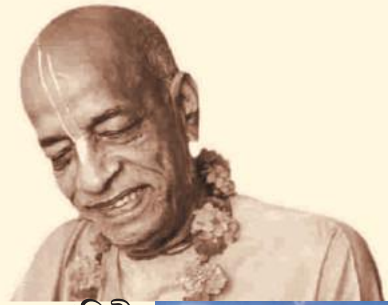

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

আমাদের কি ডারউইনকে বিশ্বাস করতে হবে?

সেই মিসিং লিঙ্কটি কি? সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজী এবং বিজ্ঞানের নাম নিয়ে চলছে। তামাশা দেখুন। পূর্ণ বিভ্রান্তিকর এবং সভ্য মানুষেরা এমন মূর্খ যে, এটিকে তারা মহান তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করছে ঃ "ডারউইনের তত্ত্ব এক মহান আবিষ্কার" সম্পূর্ণ শিশুসুলভ মূর্খতা।

৪

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক

ভোগের প্রকৃত পন্থা হচ্ছে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা। প্রকৃত আনন্দের উৎস হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি এবং এই প্রীতির প্রকাশের পন্থা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা।

৭

১০

১২ পরিচয়

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই পাপ পঙ্কিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত কলিযুগে একটা মঙ্গলময় সূচনার সৃষ্টি করার জন্য। ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। ব্রহ্মারও দুর্লভ এই কৃষ্ণপ্রেম মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অকাতরে দান করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে?

১৫ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

শাস্ত্রের বিধি-বিধান সমুহ পালন করার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মুক্ত হতে পারবে। যারা মনে করবে, আমি প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের দাস তারা সাধুসঙ্গের মাধ্যমে নিজেকে কাম, ক্রোধ ও লোভের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

প্রবন্ধ

১৮

২১ দুই প্রভুর মধুর মিলন

শ্রীগৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের প্রথম মিলন

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীগৌর চন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে নিজের প্রাণের ঈশ্বর বলে বুঝতে পেরে তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

২২

২৪ উৎসব

গৌরহরির আবির্ভাব

মা শচীদেবী দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী মেয়েরা কারা সব এসেছে। তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতেও শচীমাতা সঙ্কুচিত হচ্ছেন। সেই দেবীগণ শচীমাতার পাদপদ্মধূলি নিতে লাগলেন। এইভাবে শচীগৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ হলো।

২০

বিভাগ

৮ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের
আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন পাপ করি?

১১ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
ফুলকপি পোলাও

২৬ ছোটদের আসর
বীরবলের একটি পরীক্ষা

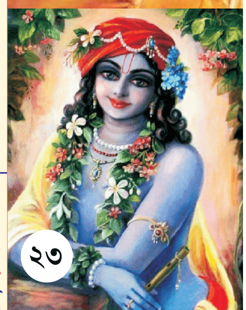
২৩

২৮ ইসকন সমাচার
গীতা জয়ন্তী

৩১ ভক্তি কবিতা
শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করো

১৪

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

কি রূপে এমনকি এই জন্মেই জীবনের পরম লক্ষ্য লাভ করা যাবে ?

কেউ কি একটি সদ্যজাত শিশুকে কি রূপে দুগ্ধ পান করতে হয় তার শিক্ষা প্রদান করে ? কেউ কি আমাদেরকে এই শিক্ষা দান করে যে, আমাদের সুখে হাস্য এবং দুঃখে ক্রন্দন করা উচিত ? এই লক্ষণগুলি প্রতিটি জীব জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং জন্মগ্রহণের পর আপনা আপনি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো এই স্বতঃস্ফূর্ত গুণাবলী কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না দেহগত কোন ব্যাধির জন্য।

অনুরূপভাবে ভগবানের জন্য প্রেম আমাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বস্তু। কিন্তু আমাদের রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য আমরা তা প্রকাশ করতে বা অনুভব করতে অক্ষম। যখন আমরা তা প্রকাশ করতে বা অনুভব করতে অক্ষম। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাধিমুক্ত হয়, সে পুনরায় হাসতে, কাঁদতে, রসিকতা করতে এবং ভোজন করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে যখন আমরা ভবরোগ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের হৃদয় সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আমরা ভগবানকে আমাদের হৃদয়ে এবং সর্বত্র অনুভব করতে সক্ষম হই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এই জড় জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে, কিভাবে নিয়মানুগ ভক্তিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ আমাদের শুদ্ধিকরণ করতে পারি এবং ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি পুনঃ জাগরিত করতে পারি।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলায় ২৩ ১৪-১৫ তে তিনি ব্যাখ্যা করছেন যে, কিভাবে এমনকি এই জন্মেই আমরা পূর্ণ শুদ্ধতা লাভ করতে পারি।

মহাপ্রভু বলেছেন, প্রারম্ভে অন্বেষীর পরমপুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) থাকা উচিৎ এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরিত্যাগ করা উচিত এবং পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য কর্ম শুরু করা উচিত।

ঠিক এক খণ্ড লোহার ন্যায় যখন তাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়, তখন সে অগ্নিময় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যখন একজন সাধারণ জীবাত্মা একজন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করে তখন তার মধ্যেও ভক্তের গুণাবলী বিকশিত হতে শুরু করে। সুতরাং তার জন্য উপদেশ হচ্ছে যে, একজন আকাঙ্ক্ষী ভক্তের সর্বদা আকুলভাবে ভক্ত সঙ্গের কামনা করা উচিত (সাধুসঙ্গ)।

সেই সাধুসঙ্গে তার ভগবানের দিব্য নাম জপ এবং তাঁর মধুর লীলা স্মরণের মাধ্যমে ভগবৎসেবা করা উচিত (ভজন)। যখন কৃষ্ণনাম কর্ণকুহরের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন তা হৃদয়ের কলুষকে নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া শুরু করে। যখন সূর্য উদিত হয় তখন অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব থাকে না, পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয়। অনুরূপভাবে যখন ভগবানের দিব্য নাম হৃদয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন কলুষতার আর কোন উপায় থাকে না, তা বিশোধিত হয়ে যায়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অভ্যাস যোগীর হৃদয়কে সর্বদা ভগবানের দিব্য নাম স্মরণে তাঁর অনুপম রূপে, গুণে এবং শাশ্বত লীলায় নিয়োজিত রাখা উচিত। যখন মন ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়ে যায় তখন এই জড় জাগতিক আসক্তি যা আমাদেরকে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং দুর্দশা প্রদান করে তা ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়। এই পর্যায়ে যন খারাপ এবং অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি দূরীভূত হতে শুরু করে তখন তাকে অনর্থ নিবৃতি বলা হয়।

তখন অন্বেষীর ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এবং দিব্য নাম জপে ও ভগবানের দিব্য নাম স্মরণে রুচির উদ্রেক হয়। সে তখন দিবারাত্র সর্বদা ভগবানের সেবার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে আনন্দ উপভোগ করে। এইভাবে তার ভগবানের প্রতি গভীর রতি (আসক্তি) জন্মায় এবং পরবর্তীতে তা অনুরাগে (ভাবে) রূপান্তরিত হয়। অবশেষে সেই আন্তরিক অন্বেষী ভগবানের প্রেমভক্তি লাভ করে যা সর্বোচ্চ লক্ষ্য, পরম লক্ষ্য যা লাভ করলে আর অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না।

চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি গৌরাঙ্গ অথবা গৌরসুন্দর নামেও অভিহিত হন, কারণ তাঁর অনুপম, মনোহর সুবর্ণময় অঙ্গকান্তি যিনি আমাদেরকে এই জন্মেই সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে দিব্য, শাশ্বত পরম সুখ উপভোগের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করেছেন।

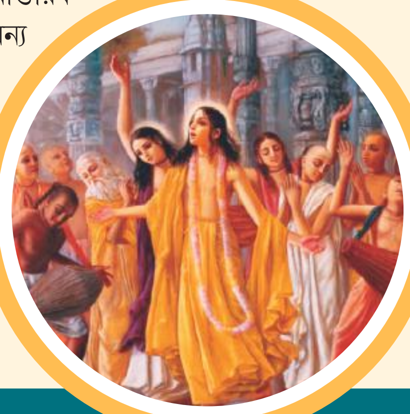

আমাদের কি ডারউইনকে বিশ্বাস করতে হবে ?

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভূপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

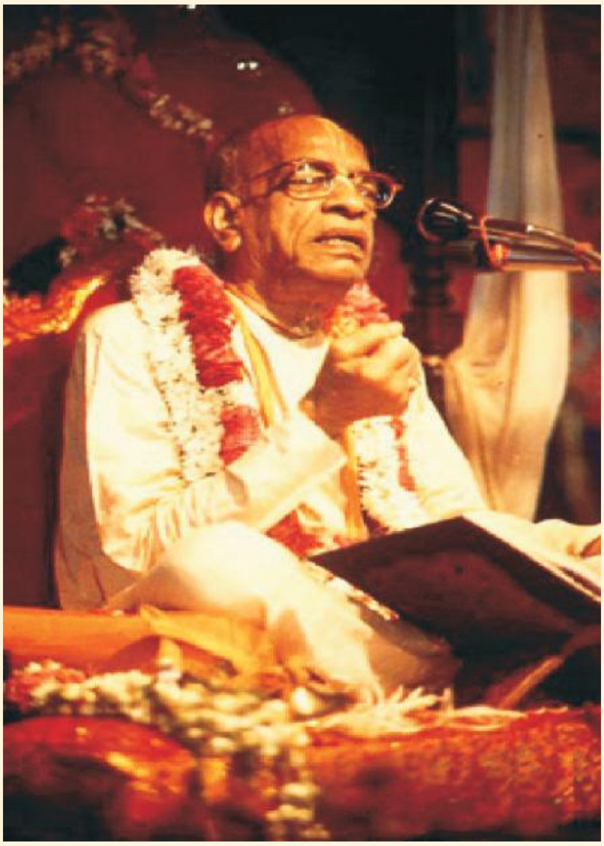

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মানুষ বানর থেকে এসেছে। সুতরাং আজ কেন বানর থেকে মানুষ আসছে না ?ভক্ত ঃ এটি মাত্র একবারই সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই একবারই সমগ্র পদ্ধতিটির জন্য যথেষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মাত্র একবার? মহা মূর্খ! আমরা দেখি প্রত্যেক ঋতুতেই ফুল এবং ফল জন্মায়। কেন একবার? এটি অন্ধ বিশ্বাস। আমাদেরকে কি এটি বিশ্বাস করতে হবে? আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, প্রাকৃতিক কারণেই একই ক্ষেতে একই ফুল বার বার জন্মায়।

ভক্ত ঃ আচ্ছা, প্রকৃত পক্ষে ডারউইন বলেছিলেন যে, এক মিসিং লিঙ্ক আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেই মিসিং লিঙ্কটি কি? সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজী এবং বিজ্ঞানের নাম নিয়ে চলছে। তামাশা দেখুন। পূর্ণ বিভ্রান্তিকর এবং সভ্য মানুষেরা এমন মূর্খ যে, এটিকে তারা মহান তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করছে ঃ ‘‘ডারউইনের তত্ত্ব এক মহান আবিষ্কার’’ সম্পূর্ণ শিশুসুলভ মূর্খতা। এখানে কোন যুক্তি নেই, কোন বিচার বোধ নেই, তারা বলে মানুষ বানর থেকে এসেছিল। সুতরাং আজ কেন মানুষ বানর থেকে আসছে না?

ভক্ত ঃ আচ্ছা, কখনো কখনো প্রকৃতি খেয়ালীপনা করে।

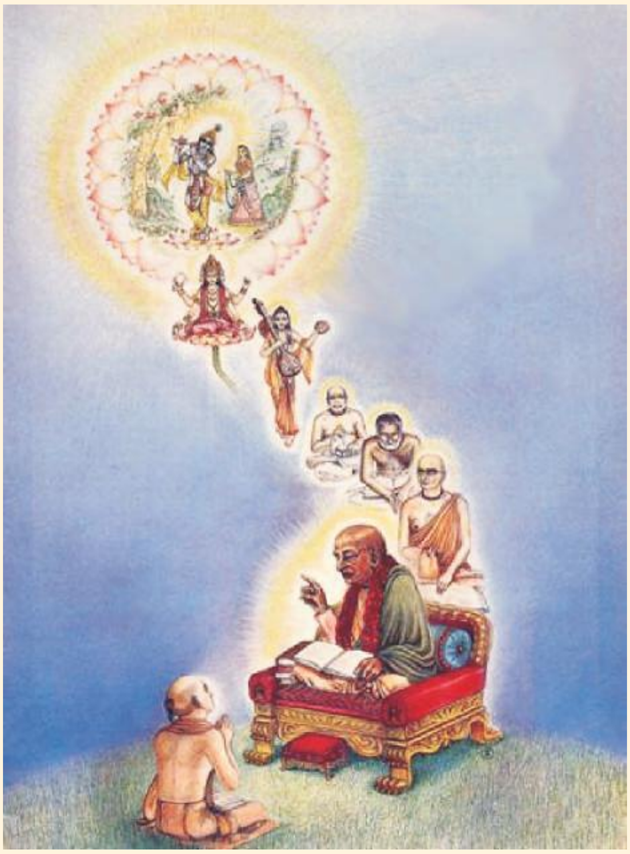

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ‘‘কখনো কখনো”—এটি শুধুমাত্র ডারউইনের ক্ষেত্রে। তার ধাপ্পাবাজী সমর্থন করার জন্য প্রকৃতি ডারউইনের সেবায় নিয়োজিত হলেন ঃ ‘‘কখনো কখনো” দেখুন, আমাদের কি এসব বিশ্বাস করা উচিত? ‘‘কখনো কখনো” এটি প্রকৃতির আইন নয়। প্রকৃতির নিয়ম অমোঘ, সামঞ্জস্য পূর্ণ। প্রকৃতি ডারউইনকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য বাধিত নয়। ‘‘কখনো কখনো”, তিনিই বলেছেন এবং শুধু তিনিই জানেন। বাকী আমাদের সকলকে তা বিশ্বাস করতে হবে। ‘‘কখনো কখনো” এটি সংঘটিত হয়েছিল এবং ডারউইনকে তা ব্যক্ত করা হয়েছিল। তিনি কেমন ভাবে জানতে পারলেন? এটি কেমন তত্ত্ব যে, ডারউইন ছাড়া আর কারোর বোধগম্য হলো না?

ভক্ত ঃ তারা আমাদের বিরুদ্ধেও একই যুক্তি ব্যবহার করছেন ঃ যে সামান্য কয়েকজন মানুষ ভগবানকে জানতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। আমরা তা বলি না। আমরা বলি ভগবান প্রথমে সূর্যদেবকে বলেছিলেন এবং সূর্যদেব তার পুত্র মনুকে বলেছিলেন, মনু ঈক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন, ইক্ষ্বাকু তার পুত্রকে বলেছিলেন এবং এইভাবে এই জ্ঞান পরম্পরা ধারার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্। এটি পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। আমরা কখনো বলি না, ‘‘ভগবান আমাকে বলেছেন”। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন, ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন। নারদ ব্যাসদেবকে বলেছেন। ব্যাসদেব অন্য সকলকে বলেছেন। যদি আমার পিতাকে বলেন এবং সেই বাণী যদি আমার পিতার মাধ্যমে আমাদের পূর্ণ পরিবারে বিতরণ করা হয় তা হলে ভুল কোথায়? এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন এবং অর্জুন যে ভাবে অনুধাবন করেছিলেন আমারাও সেই একই পন্থায় অনুধাবন করছি। অর্জুন কিভাবে অনুধান করেছিলেন তা ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে।

আমরা সেভাবে জ্ঞানকে স্বীকার করি না ঃ ‘‘শুধু ডারউইনই এটি জানতেন”। মা, তারা, এই সমস্ত তথাকথিত বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজ। ‘‘সেখানে একটি মিসিং লিঙ্ক আছে। কেবলমাত্র একবারের জন্যই বানর থেকে মানুষ এসেছিল।” সমস্তই নিরর্থক? আমাদের কি এই সব বিশ্বাস করতে হবে? এর কোন অর্থ আছে? কিন্তু যেহেতু শ্রীমান ডারউইন বলেছেন তাই তা স্বীকৃত হবে আমরা এই প্রত্যাশা করছি।

ভক্ত ঃ কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে, ঠিক যদি আপনি সর্বদা উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেন তাহলে আপনার রক্ত পাতলা হয়ে যাবে। যদি এই অবস্থা আপনি দীর্ঘায়িত করেন তা হলে আপনার মধ্যে বৃহৎ কিছু দৈহিক পরিবর্তন আসতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃকোন পরিবর্তনই সাধিত হচ্ছে না। প্রকৃতি সর্বদাই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে চলছে। সূর্য প্রাতঃকালে উদিত হয়, এটি লক্ষ লক্ষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে আসছে।

ভক্ত ঃ পরিবর্তন ধীরে ধীরে সম্পন্ন হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। কি পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে? প্রাতঃকালে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। এটি চলে আসছে। মরশুমী ফুল—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম অনুযায়ী প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সমস্ত কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চলছে। আমরা বলতে পারি এখানে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এক সুন্দর ঋতু থাকবে, কেন? কারণ আপনার গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই আমরা জানি আগামী ফেব্রুয়ারীতেও এরকমই হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি। সেখানে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। এটিই প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। এটি খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত কিছুই চমৎকার ভাবে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলছে।

ভক্ত ঃ ডারউইন তত্ত্বের এক সবল বিষয় হলো ...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমি কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পূর্ণ মূর্খতা (হাসি) আপনার মতো বোকা, ধাপ্পাবাজই এটি স্বীকার করবে।

ভক্ত ঃ তারা যুক্তি দেয় যে, পাঁচ হাজার বছর আগে কোন ইতিহাস ছিল না। তাই তারা মনে করে তার পূর্বে কোন সভ্যতা ছিল না। সুতরাং মানুষ বানরের মতোই ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমরা কল্পনা করি না। আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের পুরাতন ইতিহাস বর্তমান। এক শিশু এই রকম চিন্তা করতে পারে, কিন্তু এক জন প্রবীণ ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করবে না। কারণ ধাপ্পাবাজরা এক ধরনের চিন্তা করে, আমাদেরকে কি সেই সব অর্থহীন বিষয় বিশ্বাস করতে হবে? আমরা তাদের অর্থহীন বিষয় কেন স্বীকার করবো?

আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করি। আমরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম বলে স্বীকার করি। সমস্ত মহান মুনিঋষিগণ তা স্বীকার করেছেন। কেন আমি এই ধাপ্পাবাজি ডারউইনকে স্বীকার করবো। আমরা মূর্খ নই। আমরা স্বীকার করতে পারি না।

ভক্ত ঃ বৈজ্ঞানিকেরা সর্বদাই বলেন, ''গত বছর আমরা এক ভুল করেছিলাম, এখন সব ঠিক আছে।''

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হুম্! ''আমরা এখন উন্নত''। এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, আপনার বর্তমান তত্ত্ব সমূহ সঠিক? আপনি আরও উন্নতি করবেন। তার অর্থ এই যে, আপনি সর্বদাই ভুল।

আপনি বলেছেন হঠাৎ করে মানুষ প্রকৃতি থেকে এসেছিল।

কিন্তু আপনি কখনো দেখতে পান না যে, প্রকৃতি হঠাৎ হঠাৎ কোন কাজ করছে। সুতরাং আপনার তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত। এমনকি আপনার গণনা সমূহও ত্রুটিপূর্ণ। তাই আপনার পূর্ণ বিবৃতিটিও নিরর্থক।

ভক্ত ঃ মানুষ মনে করে জীবন ক্রমশই উন্নত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তাই তারা ধাপ্পাবাজ। এটিকেই মায়া (বিভ্রম) বলা হয়। তারা মূর্খই থেকে যায় তবুও তারা চিন্তা করতে থাকে তারা প্রগতি করছে।

কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

আমরা এই চিন্ময় জ্ঞানের মধ্যে দেখতে পাই, যা কুমার সম্প্রদায় হোক, ব্রহ্ম সম্প্রদায় হোক, লক্ষ্মী সম্প্রদায় হোক অথবা রুদ্র সম্প্রদায় হোক যার থেকে আগত হোক না কেন তা অভিন্ন। কোন প্রভেদ নেই। এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম সংহিতাতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কি রূপে তিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন। তিনি তাঁকে চিদাকাশে দর্শন করেছেন যা চিন্তামণি দ্বারা নির্মিত। চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্প-বৃক্ষ। তিনি অরণ্যে বিরাজমান। সেই অরণ্যের সমস্ত বৃক্ষরাজি হচ্ছে কল্পবৃক্ষ। সেখানে সমস্ত গাভীই হচ্ছে সুরভী গাভী। লক্ষ্মী সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমানম্। শত সহস্র লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে তাঁর ঐকান্তিক সেবায় রত। আমরা ব্রহ্মসংহিতাতেও এই অনুরূপ বর্ণনা পাই। ভগবান তাঁর ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি এখানেও বর্ণনা করা আছে ঃ আপনি আপনার ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন, আপনার মধুর হাসি দ্বারা তাদের দুঃখ দুর্দশা নিবারণ করেন। এটিই প্রকৃত সত্য যা আপনি আপনার মধুর হাসির দ্বারা প্রকাশ করেন।

সুতরাং ব্রহ্মা অবলোকন করছেন যে, পরমপুরুষোত্তম ভগবান তাঁর ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কি বিনিময় হচ্ছে? ভক্তরাও তাদের সমগ্র শ্রদ্ধা ভক্তি সহযোগে তাঁর সেবায় রত। ভগবান তাদের সেই ঐকান্তিক সেবা মধুর স্মিত হাসি সহযোগে গ্রহণ করছেন। তিনি তাদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছেন। ‘‘চিন্তা করো না, চিন্তা করো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না, বৈকুণ্ঠের অর্থই তাই। এটিই লাভ, পারমার্থিক সেবা সম্পাদনের এটিই পুরস্কার।’’ আমরা ভগবানের শরণাগত হই এবং ভগবান আমাদের আশ্বাস দেন চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই! ফলস্বরূপ সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত হয়। এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক অবস্থা।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ করেছেন যে দুই প্রকারের জীবাত্মা বর্তমান : ক্ষর এবং অক্ষর। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চাক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে।। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে। জগতে দুই প্রকারের মানুষ বর্তমান। যথা ভ্রমপ্রবণ (ক্ষর) এবং অভ্রান্ত (অক্ষর)। এই জড়জগতের সমস্ত জীবই ভ্রমপ্রবণ। তারা পতিত। কিন্তু যারা চিৎ-জগতে বিরাজমান তারা একত্বভাবে অবস্থান করে সর্বদা অক্ষর বা মুক্ত। তাদের চেতনা কৃষ্ণ-অভিমুখী এবং কৃষ্ণ তাদের সকল সুরক্ষা প্রদান করেন।

এটি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এই জড় জগতে পতিত হয়েছি তার বর্ণনা আছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আমরা কেমনভাবে চিদাকাশ থেকে পতিত হয়েছি তার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। এটি কখনো আমাদের বোধগম্য হবে না, কারণ এর প্রসঙ্গটি আধ্যাত্মিক। সুতরাং জড় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কখনোই অনুধাবন করতে পারবো না যে, আমরা কিভাবে এই জড়জগতে পতিত হলাম।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, আমরা পতিত হয়েছি। এখন আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে কিভাবে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে পারবো। কেমন ভাবে প্রত্যাবর্তন করা যাবে? সেটিই আমাদের বিষয় হওয়া উচিত এবং এর একমাত্র রাস্তা হচ্ছে পারমার্থিক সেবা। আমরা এখানে পতিত হয়েছিলাম তার কারণ আমরা কৃষ্ণসেবা বিমুখ হয়েছিলাম। যদি আমরা আবার কৃষ্ণসেবা শুরু করি তাহলে আবার আমরা সেখানে ফিরে যাবো। যেভাবেই হোক আমরা কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হয়েছিলাম এবং ফলস্বরূপ আমরা পতিত হয়েছি।

কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে, যখন জীবাত্মা কৃষ্ণবিমুখ হয় তখন মায়া তাকে ঝাপটিয়া ধরে। সুতরাং এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক আমরা কৃষ্ণবিমুখ হয়েছিলাম। কৃষ্ণবিস্মৃত হয়েছিলাম অর্থাৎ আমাদের চেতনাকে কৃষ্ণবিমুখ করেছিলাম।

সুতরাং এই হচ্ছে আমাদের জড়জগতে পতিত হওয়ার কারণ এবং মায়াবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, আমাদের অবস্থাটা অনেকটা জল ছাড়া মাছের ন্যায়। প্রকৃত পক্ষে আমাদের আবাস হচ্ছে চিৎ-জগত, কিন্তু আমরা এই জড়জগতে পতিত হয়েছি। ঠিক যেমন মাছের আপন আলয় হচ্ছে জল, কিন্তু আপনি যখন তাকে জলের বাইরে আনবেন, তখন তার অবস্থাটি কেমন হবে? সে কি চরম যন্ত্রণায় ছটফট করবে না? কিন্তু আমরা তা করছি না। আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছি না। কারণ মায়া আমাদের এই দেহ প্রদান করেছেন এবং এই দেহটির কারণেই আমরা মনে করছি আমরা বেশ সুখেই আছি। এটি সত্যিই চমৎকার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জল ছাড়া মাছের একটি উপমা বর্তমান। একটি মাছ ছিল যাকে জলের বাইরে নিয়ে আসা হলো এবং একটি কৃত্রিম যন্ত্র তাকে দেওয়া হলো যাতে করে সে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। তাই স্থলে যখন মাছ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারলো ভাবলো ঠিক আছে। মায়া তখন তাকে বলল, ‘‘তোমার একটি সুন্দর গৃহ পাওয়া উচিত’’। তখন মাছটি একটি গৃহ সংগ্রহের জন্য প্রয়াস করতে লাগল এবং সে প্রাপ্ত হলো। এই কর্মে সে খুব সুখী। তাই সংঘর্ষের পর তার গৃহ প্রাপ্তি হলো এবং সেই গৃহে মাছ বসবাস করতে শুরু করল। কিন্তু সে যখন গৃহে থাকতে শুরু করল, তার এক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সুতরাং মায়া তাকে বলল ‘‘এখানে এক সুন্দরী কন্যা আছে’’। তারপর অনেক প্রচেষ্টার পর সে কন্যাটিকে লাভ করল। তথাপি সে সুখী ছিল না। তখন মায়া তাকে বলল, কিছু অর্থ উপার্জন কর তবে আমাকে ভোগ করতে পারবে। সে তখন অর্থ উপার্জনের প্রয়াস করতে লাগল। এইভাবেই মায়া তাকে বিভ্রান্ত করতে লাগল। মাছটি এখন পুনরায় জলে ফেরার কথা অনুভব করতে লাগল। মাছ স্থলে যাই লাভ করুক না কেন, তা তাকে সুখ প্রদান করতে পারবে না, কারণ স্থলে সে যা কিছুই লাভ করুক না কেন তা তার প্রকৃত আবাস নয় তাই সে সুখী হতে পারবে না। তার প্রকৃত আবাস জল। ঠিক এই ভাবেই মায়া আমাদের বিভ্রান্ত করছে। মায়া বলছে, ‘‘এসো, উপভোগ কর, কৃষ্ণ হয়ে যাও। এই জগৎ তোমার ভোগের স্থান’’।

কিন্তু তথায় এক বৈষ্ণবের আগমন হলো। তিনি প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি শুধু আমাদের স্বরূপই ব্যাখ্যা করলেন না, তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে পারবো। বৈষ্ণবদের শিক্ষার মূল বস্তু কি? ‘‘এই দেহ ভোগ না করার চেষ্টা’’। ভোগের প্রকৃত পন্থা হচ্ছে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা। প্রকৃত আনন্দের উৎস হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি এবং এই প্রীতির প্রকাশের পন্থা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। তারপর তিনি কিভাবে নিজেকে কৃষ্ণের পরম সেবায় নিয়োজিত করা যায় তার শিক্ষা দিলেন। আমরা কৃষ্ণের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করলাম এবং আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। আমরা কৃষ্ণকে ভালবাসি, কৃষ্ণ আমাদের ভালবাসেন। ভালবাসা শুধুমাত্র কয়েকটি অক্ষরের প্রকাশ নয়, এটি অনুভূতির প্রকাশ ঃ ‘‘আমি আপনাকে ভালবাসি ...’’ কিন্তু প্রকৃত প্রেম ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশিত হয়। ক্রিয়া হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। এই দেহ ক্রিয়া করার জন্য নির্মিত। তাই এই দেহ আমাদের কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করা কর্তব্য। আমাদের অন্য আর একটি দেহ বিদ্যমান, সূক্ষ্ম দেহ, মন। মন দ্বারা আমরা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করি, শব্দের দ্বারা আমরা কৃষ্ণকথা বলি। এই বাক্‌শক্তির দ্বারা আমরা কৃষ্ণের গুণ কীর্তন করি। দেহ, মন এবং বাক্য। যখন এই তিন বস্তু কৃষ্ণের সেবায় পূর্ণ নিয়োজিত, অর্থাৎ দেহ দ্বারা কৃষ্ণের জন্য কর্ম, মন দ্বারা কৃষ্ণের জন্য চিন্তা এবং বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের গুণ কীর্তন করা হয়, একমাত্র তখনই আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এই শিক্ষাই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদেরকে প্রদান করছেন। বৈষ্ণবগণ আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদান করতেই আসেন।

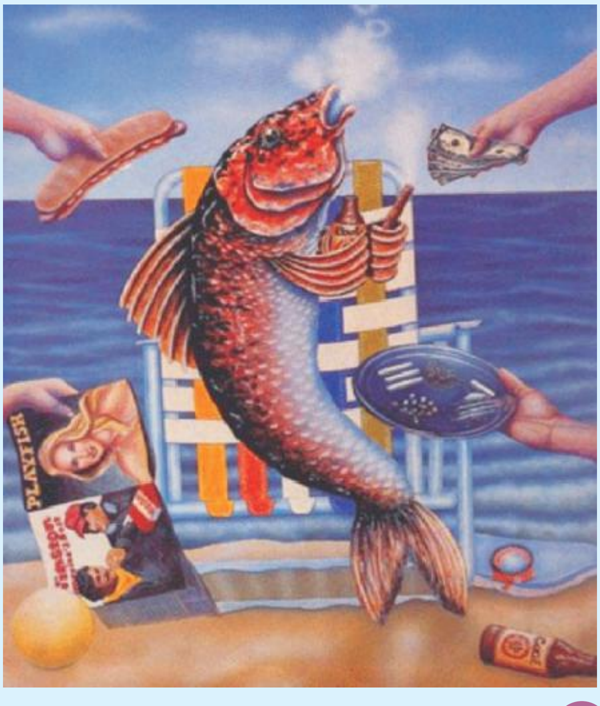

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন পাপ করি ?

—শান্তনু সাহা, নবদ্বীপ

উত্তর ঃ অভ্যাস আছে, তাই। বহু দিন ধরে একটু একটু মদ খাওয়ার অভ্যাস আছে। মুখে বলছে, আমি নেশাখোর হতে চাই না। আমিও ভদ্র হতে চাই। কিন্তু দেখা যায়, ঠিকই সে মদ খাচ্ছে। এজন্যই বলা হয়, মানুষ অভ্যাসের দাস।

তবে, সৎ সংকল্প বা সৎ ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ভজন সাধনে ব্যাপৃত থাকুন, কোনও শিল্পমূলক কর্মে নিযুক্ত থাকুন, সংসারের কর্তব্য কর্মগুলিতে সংযুক্ত থাকুন, সমাজসেবামূলক কর্মে নিয়োজিত থাকুন, সময় বৃথা অপচয় না করে কিছু না কিছু করণীয় বিষয়ে মন দিন। তাহলে আর পাপ কর্ম করার অবসরই পাবেন না। অলস মনই শয়তানের কারখানা। সেইজন্য কর্তব্য কর্মে ব্যাপৃত থাকুন।

প্রশ্ন ২। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। তাহলে আমরা যে পাপ করছি তা ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে কি না ?

উত্তর ঃ জীবকে ভগবান স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাউকে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো করে রাখেননি। যার ফলে জীব নিজস্ব স্বাধীনতায় সৎ ব্যবহার করে শ্রীভগবানের পবিত্র ইচ্ছার অনুকূলে জীবন যাপন করে সুখী সুন্দর হয়, এটিই ভগবানের ইচ্ছা। যেমন, মঙ্গলময় রাজার ইচ্ছা যে, তাঁর প্রজারা তাঁর নির্দেশমতো চলে সুখী হোক। কিন্তু বেশ কিছু প্রজা রাজার নির্দেশ মেনে চলতে চাইছে না। তারা রাজ নির্দেশ ভঙ্গ করে সুখী হবার চেষ্টা করছে, তাই রাজা তাদের জন্য সংশোধনাগার বা জেলখানা বানিয়েছেন। জেলখানা স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড জগৎ বা মায়ার জগৎ শ্রীভগবান তাদের জন্য বানালেন যারা পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজেরা সুখী হতে প্রয়াসী। আর আপনি কৃষ্ণবহির্মুখ বা ভগবৎভক্তিবিমুখ মানসিকতা গ্রহণ করার ফলে এই দুঃখময় জগতে জন্মেছেন। তাই, দুঃখ পাওয়াটাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। এখানে এসে আবার পাপকর্ম করলে দুঃখ ভোগের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে। সেটিও ভগবানের ইচ্ছা। অতএব, আপনি পাপ করবেন, কি না করবেন, সেটি আপনার নিজস্ব ইচ্ছা।

প্রশ্ন ৩। ভগবান বলেছেন যখন ধর্মের গ্লানি বা অধঃপতন হয় তখন আমি অবতীর্ণ হই। তাহলে কেন তিনি এখন অবতীর্ণ হচ্ছেন না ?

উত্তর ঃ

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার।।

ভগবানের দিব্য নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে, যে কোন মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। যিনি তা করেন, তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন। এই নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে। (চৈঃ চঃ আদি ১৭/২২)

এখন সেই 'নাম' রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

সদা নাম লইব, যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই তো আচার করে ভক্তিধর্ম পোষ।।

গভীর নিষ্ঠা সহকারে সর্বক্ষণ নাম গ্রহণ করতে হবে এবং বেঁচে থাকার জন্য যা সহজে পাওয়া যায় তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই ধরনের আচরণ করলে ভগবদ্ভক্তি পোষণ করা যায়। (চৈঃ চঃ আদি ১৭/৩০)

প্রশ্ন ৪। পৃথিবীতে গো-হত্যা হচ্ছে। ভগবান কেন প্রতিকার করছেন না ?

উত্তর ঃ ভগবান অবশ্যই প্রতিকার করছেন। এখনও বহু স্থানে গোরক্ষা ও অনাথ গোশালা স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এত গোহত্যা করেছে যে, সেই ঘাতকদের কুকর্মফল ওয়াশীল করতে হচ্ছে বহু বার গরু জন্ম পেয়ে হত হতে হচ্ছে। কর্মফল বদ্ধ জীবের কর্মগতিক বিচিত্র।

প্রশ্ন ৫। ভগবানের নাম 'জনার্দন' কেন ?

উত্তর ঃ জন (জন নামক অসুর) অর্দন (পীড়ন)। জন নাম্নো অসুরস্য অর্দনম্। জন নামক অসুরকে যিনি পীড়ন করেছিলেন, তাই তিনি জনার্দন বিষ্ণু।

জন (শত্রু) অর্দন (পীড়ন)। শত্রু বা দুর্বৃত্তদেরকে যিনি অর্দন বা দমন করেন তিনি জনার্দন।

জন (মানুষ) অর্দন (প্রার্থনা করা)। জনৈর্জীবৈঃ সেবিতুমর্দ্যতে যাচ্যতে। জীবগণ কর্তৃক যাঁর সেবা অভিলাষ করা বা প্রার্থনা করা উচিত, তিনিই জনার্দন।

জন (জন্মলক্ষণ বা সংসার) অর্দন (নাশ করা)। জন্ম-মৃত্যু দুঃখময় সংসার থেকে যিনি মুক্তিদান করেন তিনিই জনার্দন।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ভজন কর সাধন কর মরতে জানলে হয়

- ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতে করতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। রাধাকৃষ্ণের দিব্যলীলা বর্ণনা করতে করতে অকস্মাৎ শ্রীধাম মায়াপুরে দেহ রেখেছেন শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ স্বামী মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কীর্তন শ্রবণ করতে করতে অকস্মাৎ চলে গেলেন শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজ। এই তালিকার কোন শেষ নেই। কতো নাম আর উল্লেখ করা যায়।

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের দেহত্যাগও বৈষ্ণব ইতিহাসে এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে ভাস্বর হয়ে আছে।

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন ঃ

"ঠিক যেমন মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর অন্তিম দিনগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন, আমিও আমার অন্তিম দিনগুলিতে সাধুসঙ্গের আকাঙ্ক্ষা করছি। যেখানে হরিকথা নেই, সেখানে যতই বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন থাকুক না কেন এবং পরিস্থিতি যতই আরামদায়ক হোক না কেন—তাতে কিছু যায় আসে না। আমার এই সাময়িক প্রবাসের অন্তিম লগ্নে ঐরকম স্থান সমূহ এবং সঙ্গ আমার কাছে অত্যন্ত অনাবশ্যক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বলেই অনুভূত হয়।"

(পত্রাবলী ১/৪৩, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৭)

তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের হেঁয়ালি—

বাউলকে কহিও বাজারে না বিকায় চাউল (চৈতন্য চরিতামৃত ৩/১৯/২০) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অবন্তী ব্রাহ্মণের

অনেক ভক্তকে বলতে শোনা গেছে যে, ইসকন হচ্ছে Art of leaving অর্থাৎ কী করে সুন্দরভাবে এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করে ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে হয়, এই শিল্পটির প্রশিক্ষণ ইসকনে পাওয়া যায়।

কিছুদিন আগে শ্রীল প্রভুপাদের একজন ব্রহ্মচারী শিষ্য শ্রীপাদ জড়ভরত প্রভু দেহ রেখেছেন। তাঁর দেহত্যাগের একদিন আগেও কেউ বুঝতে পারেননি যে তিনি দেহত্যাগ করবেন। আজীবন বৈষ্ণব সেবা পরায়ণ এই ব্রহ্মচারী কৃষ্ণের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুরে স্বচ্ছন্দে দেহ ত্যাগ করেছেন।

বৈষ্ণব ইতিহাসে এই Art of leaving-এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শরশয্যায় শায়িত বৈষ্ণব মহাজন ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবদের দিব্য উপদেশ প্রদান করতে করতে স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। পরীক্ষিত মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর—এরকম অনেকেই তাঁদের স্বচ্ছন্দ দেহত্যাগের জন্য বৈষ্ণব ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন

একটি শ্লোক বিশেষভাবে আবৃত্তি করতেন ঃ

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ।।

সর্বদেব সমন্বিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্লেশদায়ক অবস্থায় (সর্বস্বান্ত বার্ধক্যে) আনয়ন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য নৌকা স্বরূপ (প্লবঃ)।

এই শ্লোক অনুসারে, দুঃখদায়ক পরিস্থিতি একজন ভক্তের অন্তরে বৈরাগ্য সম্পদের জনক হয়ে থাকে। দেহ সুখ মানুষের মনে এই জড় জগতের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে। আসক্তির ফলে জীবকে অনন্তকাল ধরে এই জড় জগতে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়। কিন্তু ভগবান যখন কোনও ভক্তকে সর্বস্বান্ত করে দুঃখময় বার্ধক্যে উপনীত হবার সুযোগ প্রদান করেন, তখন অবন্তী ব্রাহ্মণের মতো তিনি বৈরাগ্য নামক নৌকা লাভ করেন এবং সেই নৌকার সাহায্যে তিনি এই দুঃখময় ভবসাগর অতিক্রম করতে পারেন। তাই দেহ সুখের মোহ নয়, দুঃখ সম্ভূত বৈরাগ্যই উন্নত ভক্তের জীবনে এক পরম আশীর্বাদ। ১৯৩৬ সালের ২১শে জানুয়ারী যোগপীঠে প্রবচন প্রদানকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভণ্ড বৈষ্ণবদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, কোনও ভক্ত যেন আলস্যে সময় নষ্ট না করে। ভক্তদের জীবনে কখনোই যেন ভণ্ডামি প্রবেশ করতে না পারে। তিনি বলেন যে, একজন ভণ্ড ভক্ত হওয়ার চেয়ে পশু, পাখি, কীট পতঙ্গ বা অসংখ্যবার নিম্নযোনিতে জন্মগ্রহণ করা বরং অনেক ভাল। (গৌড়ীয় ১ ২৭৯-৯৫)

তিনি বলেন ঃ

"আমরা সকলেই মৃত্যুপথ যাত্রী প্রবাসী। প্রত্যেকেই অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তাই, কি নারী কি পুরুষ, উচ্চ নীচ, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বিজ্ঞ, মূর্খ—যে কেউ এই অতীব দুর্লভ মানব জন্মকে সফল করতে পারে পূর্ণ আনন্দময় পরম পবিত্র শ্রীহরির দাসানুদাস হয়ে। এমনকি এই বদ্ধ দশাতেও মুক্ত হওয়া সম্ভব। শুধু অত্যধিক চেষ্টার প্রয়োজন।"

(গৌড়ীয় ১৫ ৩২১)

সুতরাং সিদ্ধান্ত হল এই যে, ভণ্ড বৈষ্ণব হওয়ার চেয়ে কোটি কোটি জন্ম ধরে শেয়াল কুকুর হওয়া ভাল। ভজন কর সাধন কর—মরতে জানলে হয়। আমাদের সকল ভণ্ডামি এবং প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তির চরম পরীক্ষা হবে মৃত্যুর সময়।

ফুলকপি পোলাও

উপকরণ ঃ ফুলকপি টাটকা মাঝারী সাইজের ১টি। নারকেল কোরা ২ কাপ। কাঁচা লংকা ৫টি। লবণ ও হলুদ নিজের পছন্দ মতো। চিনি ২ টেবিল-চামচ। গোল মরিচ গুঁড়ো ২ চা-চামচ। আমূলের টক দই ১০০ গ্রাম। ঘি ২ কাপ। তেজপাতা ৫টি। সরিষা ১ চা-চামচ। গোটা জিরা ২ চা-চামচ। ৩টি বড় এলাচের দানা। বাসমতি চাল ২৫০ গ্রাম। ধনেপাতা ১ কাপ। আদা ১ টুকরো।

রন্ধন পদ্ধতি ঃ নারকেল কোরা, কাঁচা লংকা, আদা, ধনেপাতা, টকদই একসঙ্গে শিল-নোড়াতে বা গ্রাইণ্ডিং মেশিনে বেটে নিন। এই বাটা মিশ্রণটি একটি পাত্রে রাখুন। তার পর ওই পাত্রে হলুদ, লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে দিন।

বাসমতী চাল ধুয়ে রাখুন। ফুলকপি মাঝারী আকারে টুকরো টুকরো করুন। উনানে কড়াই বসান। তাতে ঘি দিয়ে ফুলকপি টুকরোগুলো বাদামী করে ভেজে তুলে রাখুন।

তারপর ঐ কড়াইতে আর একটু ঘি দিন। তারপর তেজপাতা, গোটা জিরা, গোটা কালো সরিষা ফোড়ন দিন। তারপর বড় এলাচের দানা দিন। খুনতি দিয়ে নাড়িয়ে দিন। চাল ঢেলে দিয়ে পাঁচ মিনিট নাড়িয়ে ভাজুন।

তারপর পরিমাণ মতো জল দিন। দশ মিনিট চাল ফুটতে দিন। তারপর ভাজা ফুলকপি বাটা মিশ্রণের সঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে ফুটন্ত চালের মধ্যে মিশিয়ে দিন। তারপর একটা ঢাকনা চাপা দিন। আঁচ কমিয়ে দিন। দশ মিনিট সেদ্ধ হতে দিন।

তারপর ঢাকনা খুলে দেখুন চাল ঠিকমতো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং জল শুকিয়ে গেলে উনান নিভিয়ে দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট মতো বসিয়ে রাখুন। তাতে অন্ন বেশ জমাট বেঁধে যাবে। তারপর ঢাকনা খুলে বাকি ঘি এবং গরম মশলা দিয়ে চামচ দিয়ে অন্ন নাড়িয়ে দিন।

এই ফুলকপির পোলাও থালাতে সাজিয়ে শ্রীশ্রীগৌর নিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ভক্ত শিবাজী

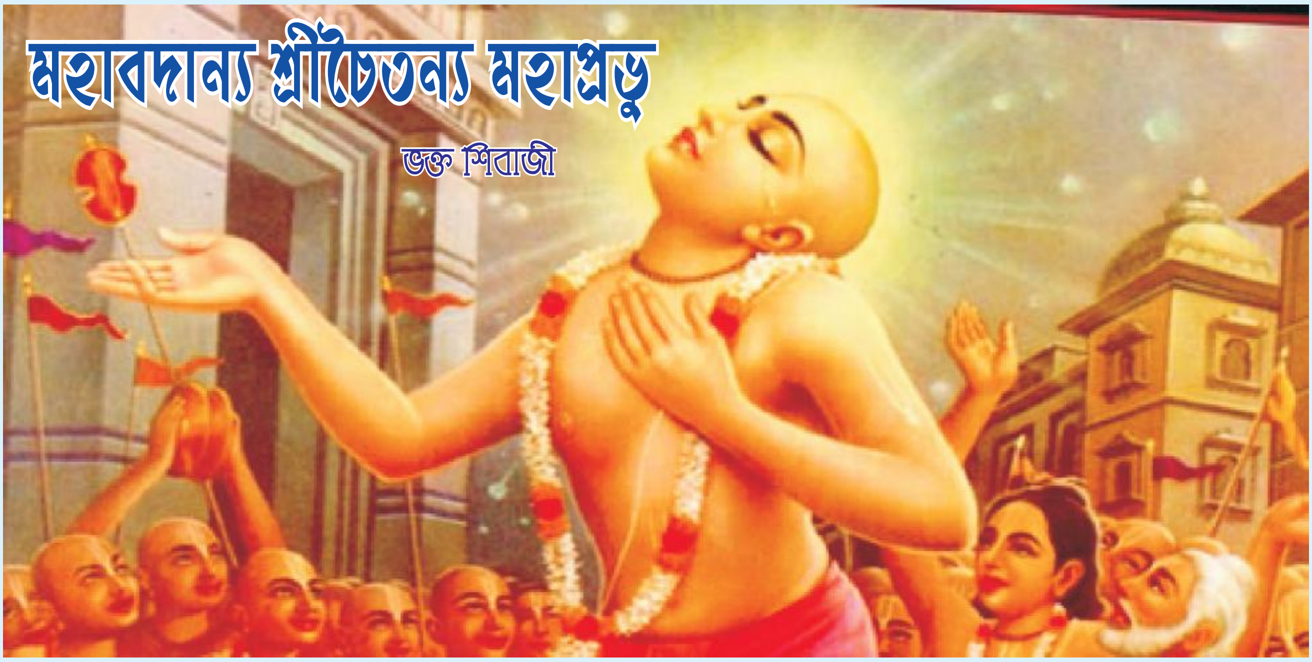

চন্দ্র গ্রহণের ছলে হরিনাম সংকীর্তন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এলেন তখন চন্দ্র গ্রহণ হচ্ছিল, অমঙ্গল সূচক সময় যখন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করছিল। সাধারণত ভগবান যখন আসেন একটা পরম মঙ্গলজনক পরিস্থিতির সূচনা করে। যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ধরাধামে এসেছিলেন, তখন সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলি একটি অপূর্ব সুন্দর স্থিতিলাভ করছিল। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এলেন তখন একটা অমঙ্গল সূচক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন, কারণ অমঙ্গলের সময় সবাই একত্রিত হয়ে হরিনাম করবে। সেই কারণে তিনি আসার সময় অমঙ্গলের বাতাবরণ সৃষ্টি করলেন। সকলকে দিয়ে হরিনাম করিয়ে তিনি এলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছন্ন অবতার। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোগ্য ও অযোগ্য না দেখে সবাইকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি বলেছিলেন একদিন আসবে যখন সমগ্র পৃথিবী কৃষ্ণনাম কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে আপ্লুত হবে।

কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত ছোট কুকুর ছানা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্য বয়সে নিমাই নাম ছিল। একদিন নিমাই পণ্ডিত তার খেলার সাথীদের সঙ্গে গঙ্গার তীরে ছোট ছোট কতকগুলি নবজাত কুকুর ছানাকে দেখতে পেল। কোন কারণে সেই কুকুর ছানাগুলোর মা সেখানে ছিল না। ছানাগুলির জন্ম দিয়ে মা কুকুর কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। সেই কুকুরের ছানাগুলি নিমাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে লাফালাফি ও খেলাধূলা করছিল। নিমাই সেই কুকুর ছানাগুলির মধ্যে একটি ছানাকে নিয়ে খেলা করছিল। তার বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল তুমি কেন সব থেকে সুন্দর কুকুরছানাটিকে নিয়ে খেলা করছ। তখন নিমাই বলল, না না, আমরা সবাই মিলে একে নিয়ে খেলা করব। আমরা একে নিয়ে আমার বাড়ি যাব এবং সবাই মিলে খেলা করব।

তারা সবাই মিলে নিমাইয়ের বাড়িতে গেল কুকুরের ছানাটিকে নিয়ে। সেই সময় শচীমাতা বাড়িতে ছিলেন না। গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। নিমাই তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কুকুর ছানাটিকে নিয়ে খেলা করছিল। কখনো আলিঙ্গন করছিল, কখনো চুম্বন করছিল, কখনো মাথায় তুলে লাফালাফি করছিল। ঈর্ষান্বিত বন্ধুটি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিল। তখন নিমাই বলল, তুমি কেন সকলের সঙ্গে তর্কাতর্কি কর। সে বলল, তুমি সব থেকে সুন্দর কুকুরের ছানাটিকে নিয়েছো তাই। তারপর রেগে গিয়ে বন্ধুটি সেই ঘর থেকে দৌড়ে যাবার পথে শচীমাতাকে দেখতে পেয়ে বলল, আপনার ছেলে ঘরে কি করছে তা আপনার দেখা উচিত। সে একটি নোংরা কুকুরের ছানাকে এনেছে, তাকে আদর, আলিঙ্গন ও চুম্বন করছে। শচীমাতা বললেন, আমাদের নিমাই কখনো এই রকম করতে পারে না। এই বলে তিনি সরে গিয়ে ছুটে এসে দেখলেন নিমাই তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে একটি কুকুরের ছানা নিয়ে খেলছে।

শচীমাতা বললেন, আমাদের বাড়িটা একটি মন্দির

এবং খুবই ছোট বাড়ি। এখানে তুমি পশু ও জন্তুদের রাখতে পারো না। আমরা ব্রাহ্মণ পরিবারের, তাই আমাদের বাড়িতে কুকুর ছানাটিকে রাখা, সম্মান হানিকর হবে। গৃহ অশুদ্ধ হবে। তুমি তো জানো আমরা কিভাবে থাকি। নিমাই মায়ের কোলে উঠে গিয়ে বলল, কিন্তু আমি এই কুকুরের ছানাটিকে খুব ভালবাসি। শচীমাতা বললেন, তুমি এখন ক্ষুধার্ত, যাও গঙ্গায় স্নান সেরে আসো। আমি তোমার জন্য সুন্দর প্রসাদ বানাচ্ছি আর আমি তোমার কুকুর ছানাটিরও খেয়াল রাখছি। কিন্তু নিমাই ছানাটিকে যে পাতলা দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, তা থেকে মুক্ত করে তাকে শচীমাতা দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা নিমাই জানতে পেরে ঘরে এসে শচীমাতাকে প্রশ্ন করেন, কোথায় গেল ছানাটি? শচীমাতা বললেন, কোথায় গেল বলো তো তোমার ছানাটি? নিমাই বলল, ওই ছানাটি আমার খুবই প্রিয় ও আদরের ছিল। ওকে দূরে পাঠিয়ে তুমি আমাকে কত দুঃখিত করলে? শচীমাতা বললেন, প্রসাদ গ্রহণ কর, আমরা ওকে খুঁজে নিয়ে আসবো।

কিন্তু তারপর কুকুর ছানাটি কৃষ্ণপ্রেমে ভাবাবেশে পূর্ণ খুশিতে আনন্দিত ও উত্তলিত হতে হতে শতশত লোকের সামনে নবদ্বীপের রাস্তার উপরে রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ বলে কীর্তন করছিল। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছিল। তার নয়নে অশ্রুধারা ঝরছিল। তার শরীরের লোমগুলি ভাবাবেগে খাড়া হয়ে গিয়েছিল। সে এইভাবে কৃষ্ণের নাম নিতে নিতে দেহ পরিত্যাগ করল । সবাই দেখল, গোলোক থেকে রথ এলো এবং সেখানকার দিব্য ব্যক্তিরা কুকুর ছানাটিকে নিয়ে রথে উঠে গেলেন এবং একটা সুন্দর দেহ পেয়ে চলে গেল। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন এবং কুকুরের ছানাটিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করলেন।

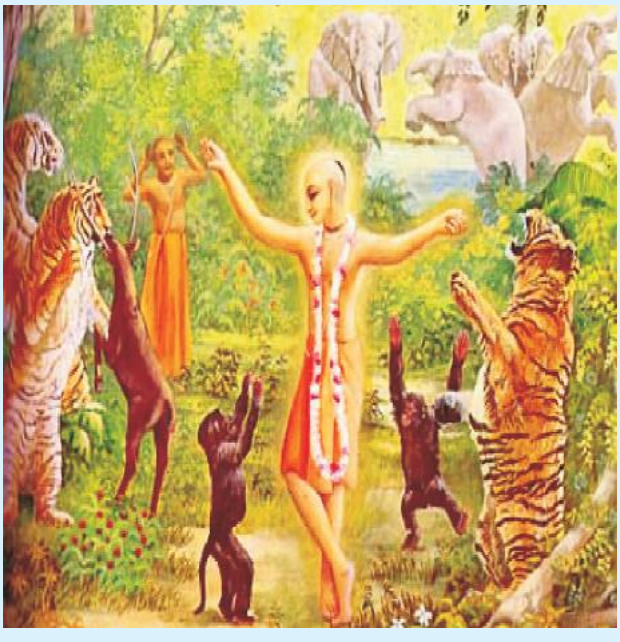

ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গলে পশুদের কৃষ্ণভাবাবেশ

এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনস্থির করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভূমি বৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করবেন। একদিন সকালে সূর্য উঠার পূর্বে ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সহায়ক হিসাবে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

যাবার সময় পথে ঝাড়িখণ্ডের অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। একদল বাঘ, হাতি, গণ্ডার মহাপ্রভুর খুবই সামনে এসে গিয়েছিল। মহাপ্রভু তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। জন্তু জানোয়াররা কেউই মহাপ্রভুকে আঘাত করছিল না। বলভদ্র ভট্টাচার্য এই দৃশ্য দেখে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে পশুগুলি সবাই একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিছু হাতির গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। তারা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উচ্চারণ করতে শুরু করেছিল। হরিণ ও বাঘগুলি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডাকছিল এবং ভাবাবেশে নাচছিল। বাস্তবিকভাবে বাঘ ও হরিণগুলি একে অপরকে আলিঙ্গন করছিল এবং চুম্বন করছিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য এই বিস্ময়কর দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে পেরে চমৎকৃত হচ্ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত মজা দেখে শুধুই মৃদু হাসছিলেন

শিবানন্দ সেনের কুকুরের ভগবৎধামপ্রাপ্তি

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক অসাধারণ সম্পর্কের কথা বলেছেন শিবানন্দ সেন ও তাঁর প্রিয় কুকুরের মধ্যে।

একবছর তীর্থযাত্রীরা পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। একটা কুকুর সেই যাত্রীদলের সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই যাত্রা করে। যখন হঠাৎ করে যাত্রীদল একটি নদী পার হচ্ছিল তখন মাঝিরা সেই কুকুরটিকে নৌকার উপরে নিতে অস্বীকার করে। শিবানন্দ সেন শেষ পর্যন্ত দশটি কড়ির মূল্যে কুকুরটিকে নৌকায় উঠায়। একদিন শিবানন্দ সেনের পরিচারিকা কুকুরটিকে খেতে দিতে ভুলে গিয়েছিল এবং সেই দিন কুকুরটা কোথাও যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। শিবানন্দ সেন দশজনকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তারা সফল হয়নি। শিবানন্দ সেনের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি সেই দিন।

গভীর চিন্তার মধ্যে ভক্তরা পুরী পৌঁছায় এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেন, এবং জগন্নাথ দর্শনে মন্দিরে যায়। মহাপ্রভু সবাইকে প্রসাদ পরিবেশন করে নিজে ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং তারপরে সকলকে তাদের অতিথি নিবাসে পৌঁছে দেন। তার পরবর্তী দিনে ভক্তরা মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং সেখানে কুকুরটিকে দেখে দুর্দান্তভাবে আশ্চর্য চকিত

হয়। মহাপ্রভু হাসছিলেন, কুকুরটিকে নারিকেল খাইয়ে ছিলেন এবং তাকে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করতে বলছিলেন। কুকুরটা স্পষ্টভাবে ভেঙে উচ্চারণ করছিল এবং প্রসাদ গ্রহণ করছিল, যা মহাপ্রভু নিজ হাতে পরিবেশন করেছিলেন। সবাই খুবই অদ্ভুতভাবে আশ্চর্য চকিত হয়েছিলেন এই অসাধারণ ঘটনার সাক্ষী থাকতে পেরে। শিবানন্দ সেন সেই সময় কুকুরটিকে দণ্ডবৎ করেছিলেন অত্যন্ত নমনীয় ভাবে। এর পরে আর কুকুরটিকে দেখতে পাওয়া যায়নি। মহাপ্রভুর কৃপায় কুকুরটি একটি চিন্ময় দেহ লাভ করে ভগবৎ ধামে চলে যায়।

হরিদাস ঠাকুর ও মহাপ্রভুর কথোপকথন

একদিন হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু দেখা করতে আসে এবং কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন, প্রিয় হরিদাস, এই কলিযুগে বেশির ভাগ মানুষ বৈদিক সংস্কৃতি ভুলে যবনে পরিণত হয়েছে। এখানে যবন বলতে বিশেষ কোন শ্রেণীর মানুষকে বোঝানো হচ্ছে না, যারা বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী তাদের সকলকেই বোঝাচ্ছে। যবনেরা সকলে শুধুমাত্র গো হত্যা ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পাপ করতে মত্ত হচ্ছে।

কেমন ভাবে এই যবনেরা উদ্ধার পাবে? মর্মাহত হয়ে মহাপ্রভু বললেন, এদের মুক্তির কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। হরিদাস ঠাকুর বললেন—

যবন সকলের 'মুক্তি' হবে অনায়াসে।
'হা রাম' 'হা রাম' বলি কহে নামাভাসে।।

মহাপ্রভু, চিন্তা করবেন না, যবনদের জাগতিক অবস্থা দেখে দুঃখ পাবেন না। কারণে যবনেরা 'হা রাম হা রাম' বলতে খুবই অভ্যস্ত (ভগবান রাম), তারা খুবই সহজে মুক্তি পাবে ভগবান রাম নামের নামাভাসে। হরিদাস ঠাকুর আর বলেন—

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ, লহে সেই নাম।।

প্রগতিশীল ভক্তরা ভাবাবেশে 'হে ভগবান রামচন্দ্র' বলেন। কিন্তু যবনেরা সৌভাগ্য ক্রমে 'হা রাম হা রাম' বলে ভগবানের নাম নেয়। হরিদাস ঠাকুর বলেন, একজন বাচ্চা আগুনে হাত দিলে যেমন হাতটি পুড়ে যায়, তেমন প্রাপ্তবয়স্ক কেউ দিলেও ঠিক তেমন ভাবেই পুড়ে যায়। ঠিক তেমন ভাবেই মহান ভক্ত রাম নাম নেয় আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অনুধাবন করে, আর যবনেরা হা রাম হা রাম বলে জঘন্য কিছু বোঝাতে। কিন্তু দুইজনই আধ্যাত্মিক ফল লাভ করে। কেউ জঘন্য বোঝাতে 'হা রাম' বললেও ভগবানের নামের শক্তি নষ্ট হয়ে যায় না। তা তো একই থাকে। যেমন জীবনের অন্তে যবন অজামিল নারায়ণ বলে নিজের প্রিয় পুত্রকে ডেকে ভগবানের নামের প্রভাবে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

মহাবদান্য

মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে সমস্ত মঙ্গলের সূচনা হয়। কলিযুগ হচ্ছে একটা পাপের সমুদ্র, কলের্দোষনিধে রাজন্, কলিযুগটা হচ্ছে একটা পাপের নিধি, পাপের চরম অবস্থা। সমস্ত পৃথিবীটা পাপের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু এই কলিযুগের একটি মহান গুণ রয়েছে 'কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরম ব্রজেৎ'। ভগবানের নাম কীর্তন করলে পরম মঙ্গলের সূচনা হয়। সেই সূত্রে বলা হচ্ছে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের যে ধ্বনি যত দূরে যাবে সেই স্থানের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন এসেছেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন এই পাপ পঙ্কিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত কলিযুগে একটা মঙ্গলময় সূচনার সৃষ্টি করার জন্য। ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। ব্রহ্মারও দুর্লভ এই কৃষ্ণপ্রেম মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অকাতরে দান করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্যতার রূপ করুণাসিন্ধু যা দিয়ে তিনি মহাপতিত কলিযুগবাসীকে কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত করেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাসুরসম্পদ বিভাগ যোগ)

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগৎকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। যার ঊর্ধ্ব শাখাগুলি দিব্য শাখা আর নিম্ন শাখাগুলি আসুরিক শাখা। এই উভয় শাখাসমুহ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। আর অশ্বত্থ বৃক্ষের অন্যান্য শাখাগুলিকে জীবের কর্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু শুভ কর্ম আর কিছু অশুভ কর্ম। এখন ষোড়শ অধ্যায়ে দিব্যগুণ সমুহের বর্ণনা করা হয়েছে, যা জীবকে বৃক্ষের উপরের শাখায় উন্নীত করে, মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করে।

আর ষোড়শ অধ্যায়ে এও বর্ণনা করা হয়েছে, আসুরিক গুণ ও মনোভাবের কথা; যা জীবকে বৃক্ষের নিম্নতর শাখাগুলোতে অধঃপতিত করে শেষ পর্যন্ত নরকে নিয়ে যায়।

ষোড়শ অধ্যায়ের বিভাজন

১নং-৬নং—দৈব এবং আসুরিক গুণাবলী।

৭নং-২০নং—আসুরিক স্বভাব।

২১নং-২৪নং—সিদ্ধান্ত নিতে হবে সঠিক গন্তব্য

১নং-৩নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাব্বিশটি (২৬) দৈবগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির একটি তালিকা দিয়েছেন। যা জীবকে বৃক্ষের উপরের শাখায় উন্নীত করে মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করে। ৩নং শ্লোকের 'অভিজাতস্য' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ দৈবী প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করা। দিব্যগুণসম্পন্ন সন্তান লাভের জন্য শাস্ত্রানুমোদিত দশটি বিধি মানুষকে অনুসরণ করতে হয়। গীতায় ৭।১১নং শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলেছেন "আমি ধর্মের অবিরোধী কাম" অর্থাৎ দিব্যগুণসম্পন্ন ধার্মিক সন্তান লাভের জন্য যে স্ত্রীসহবাস, তা

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

২নং শ্লোকে—'অপৈশুনম্' শব্দটির অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ অন্যের দোষ না দেখা। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যদি কোন ভক্ত গর্হিত কর্ম করে, তা হলে কি তার দোষ দেখা বা সমালোচনা করা ঠিক? শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, "নিন্দনং দোষকীর্তনং" সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক দোষ-ত্রুটি কীর্তন বৈষ্ণব অপরাধ। শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী গুরুমহারাজ বলেছেন—অথরিটি না হলে দেখা যাবে না। সমবয়স্ক হলে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। আর সিনিয়র হলে দেখা ও বলা দুইই যাবে না।

৪নং—ভগবান এখানে ছয়টি আসুরিক গুণের কথা বর্ণনা করেছেন—যেগুলি গ্রহণ করলে মানুষ সহজেই নরকের পথে গমন করতে পারে।

৫নং—অর্জুন চিন্তা করছিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটা আসুরিক গুণের পরিচয়—তাই ভগবান সন্দেহ দূর করবার জন্য বললেন, "মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব।" 'শোক করো না, কেন না তুমি দৈবী সম্পদসহ জন্ম গ্রহণ করেছ।' ভগবান এটাও বোঝাতে চাইছেন, যুদ্ধ করাটা মোটেই আসুরিক স্বভাবের পরিচয় নয়।

৬নং—এই জগতে দুই প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই পিতা হলেন প্রজাপতি। কিন্তু যাঁরা বৈদিক নির্দেশ মেনে চলেন তাঁরা হলেন দেবতা, আর যারা বৈদিক নির্দেশ মেনে চলে না তারা হচ্ছে অসুর।

৭নং—এই শ্লোকে আসুরিক প্রবৃত্তির বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৮নং—শ্লোকে বিশেষ করে অসুর ব্যক্তিদের দর্শন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অসুর ব্যক্তিরা মনে করে এ জগৎ অলীক, মিথ্যা, এবং জগৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ঈশ্বর বা ভগবান নেই। তারা মনে করে কেবলমাত্র স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের ফলে যেমন একটা শিশুর জন্ম হয়, এই পৃথিবীর কেবলমাত্র জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলেই জীব সকলের উদ্ভব হয়েছে। তাই তাদের মতে আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই।

৯নং—আসুরিক মনোভাব ও কার্যকলাপের কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০নং—এখানে আসুরিক মনোবৃত্তির কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১) তারা অতৃপ্ত কামের আশ্রয় গ্রহণ করে।

(২) গর্ব ও মিথ্যা অহংকারে সর্বদা মদমত্ত থাকে।

(৩) সর্বদা অশুচি বা ব্যভিচারমূলক কর্মে ব্রতী হয় এবং অনিত্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১১নং ও ১২নং শ্লোকে আসুরিক ব্যক্তিদের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।—(১) ইন্দ্রিয় সুখকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে অপরিমেয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ভোগ করে এবং অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে।

১৩-১৫নং শ্লোকে আসুরিক ব্যক্তিদের ভোগ করার মনোভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করার পর তারা মনে করে "আমিই ঈশ্বর এবং আমিই ভোক্তা, আমি সিদ্ধ ও বলবান, আমি খুব সুখী ব্যক্তি"।

১৬নং-আসুরিক ব্যক্তির কার্যকলাপের ফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১) নানা প্রকার দুশ্চিন্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। (২) মোহজালে জড়িয়ে পড়ে। (৩) কাম উপভোগের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। (৪) অশুচি নরকে পতিত হয়।

১৭নং—এখানে অসুরদের কপটতাপূর্ণ প্রকৃতি ও প্রচারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

আত্মভিমানী, অনম্র এবং ধন ও মানে মদমত্ত ব্যক্তিরা সদম্ভে নাম-মাত্র যজ্ঞ সম্পাদন করে—'অবিধিপূর্বকম্' মানে শাস্ত্র বিধি অনুসরণ না করে যজ্ঞ সম্পাদন করে।

১৮নং শ্লোকে—অসুরদের ভণ্ডামিপূর্ণ প্রকৃতি ও প্রতারণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) তারা মিথ্যা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের দ্বারা সর্বদা মোহগ্রস্ত।

(২) ভগবান পরমাত্মা রূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান; তাঁর প্রতিও তারা মাৎসর্যপরায়ণ।

(৩) তারা প্রকৃত ধর্মের পথকে নিন্দা করে এবং সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের প্রতি তারা ঈর্ষান্বিত।১৯নং ও ২০নং শ্লোক দুটিতে অসুরদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, সপ্তম শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত আসুরী ব্যক্তিদের দুর্গুণ ও দুরাচারের বর্ণনা করে—ভগবান এবার ১৯নং ও ২০নং শ্লোকে তাদের নিন্দা করে তাদের দুর্গতি বর্ণনা করেছেন যাতে পরবর্তীতে এই রকম দুর্গুণপূর্ণ আচরণ কোন ব্যক্তি না করতে চান। ১৯নং শ্লোকে আসুরী জন্ম বলতে বোঝাতে চাইছেন—সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছে, শুয়োর কুকুর, কাক, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গাদি আছে ঐ গুলি সবই আসুরী জন্মের অন্তর্গত।

কোন কিছুই ঘটনাচক্রে হয় না—এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই কোনো বিশেষ আত্মা বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়।

২০নং শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে জন্ম-জন্মান্তর ধরে নরক বাস করবে এই ধরনের অসুরদের পরবর্তী কোন জীবনেই ভগবানের কৃপা লাভ করার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। 'মাম্ অপ্রাপ্য'—'আমাকে না পেয়ে' এই কথা কি জন্য

ভগবান বললেন—এর উত্তর হচ্ছে, মনুষ্য জন্মে জীবের ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকার আছে। সেই অধিকার লাভ করার জন্য সাধু, গুরু, শাস্ত্র আছে—সেই সুযোগ লাভ না করে আসুরী স্বভাব অবলম্বন করে শাস্ত্রের কথাকে অমান্য করে তোমার প্রকৃত অধিকারকে বঞ্চিত করেছ। তাই তোমার এই কঠোর শাস্তি। যাতে দয়াময় ভগবান অন্যকে না করার জন্য সতর্ক বাণী প্রদান করছেন।

'অধমাম্ গতিম্' মানে অধমগতি—এর দ্বারা ভগবান বোঝাতে চাইছেন হাজারবার লক্ষবার আসুরী যোনিতে জন্ম নিয়ে পরে তার থেকেও নীচ, মহাযাতনাময় কুম্ভীপাক মহারৌবব, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ইত্যাদি ভয়ানক নরকে পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে নরকের বর্ণনা আছে)

২১নং ও ২২নং শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মানুষ আসুরিক ও নারকীয় জীবনে নিপতিত হয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন, অর্জুন এখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন ঃ—এই সব কথা শুনে মানুষ যদি এই সব আসুরিক গুণগুলি ছাড়তে চায়, তবে তার জন্য তারা কি করতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, একান্ত নিজের ইচ্ছায় জীব আসুরিক গুণ সমুহ গ্রহণ করে অধঃপতিত হতে পারে, আবার তা ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শাস্ত্রের বিধি-বিধান সমুহ পালন করার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মুক্ত হতে পারবে। যারা মনে করবে, আমি প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের দাস তারা সাধুসঙ্গের মাধ্যমে নিজেকে কাম, ক্রোধ ও লোভের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু যারা নিজেদেরকে ভোক্তা বলে মনে করবে তারা কাম, ক্রোধ ও লোভের দাসত্ব স্বীকার করে নরকে গমন করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন এই অধ্যায়টি শেষ করার জন্য দুটি শ্লোকের অবতারণা করেছেন। প্রথমটি (২৩ নং) নেতিবাচক ভঙ্গিতে তিনি আমাদের শাস্ত্র-উক্ত কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন। খেয়ালখুশি মতো কাজ করার ফলে সে কখনই সিদ্ধি লাভ করতে পারবে না এবং ভগবানের দ্বারা দণ্ডিত হবে।

তারপর ২৪নং শ্লোকে ইতিবাচক ভঙ্গিতে তিনি একই নির্দেশ প্রদান করছেন, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র অনুযায়ী তুমি তোমার কর্ম করতে যোগ্য হও।

একজন বিজ্ঞানের ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না—আমি বললাম খুব ভালকথা-সত্যিকথা বলেছেন—তবে সব কিছু নয়। যেমন আপনার চোখের সব থেকে নিকটে আপনার চোখের পাতা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। এখন যদি আপনার চোখের পাতায় একটা ছোট পোকা পড়েছে এবং আপনার চোখের ভিতর প্রবেশ করেছে—তখন আপনি যদি বলবেন আমি যা নিজের চোখে দেখি না তা বিশ্বাস করি না—তা হলে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। জানার জন্য দুইটি উপায়—অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করা; না হলে আয়নার সাহায্যে দেখা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষের প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন

– পুরুষোত্তম নিতাই দাস

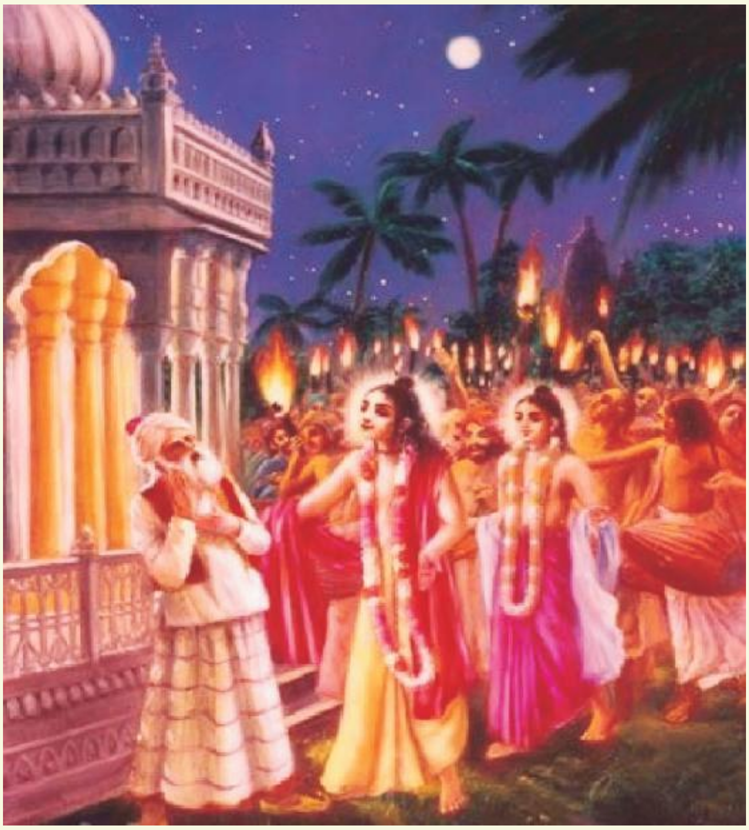

ভারতবর্ষ এক গৌরবময় দেশ যেখানে পবিত্র নদীসমূহ নিরন্তর প্রবাহমান এবং স্থানসমূহ পবিত্র করে চলেছে। সমস্ত পর্বতের রাজা বিখ্যাত হিমালয়ের মুকুট হিসাবে বিশেষ গৌরব বহন করে চলেছে। এই সেই ভূমি যেখানে ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান কৃষ্ণ অনেক দিব্যলীলা আস্বাদনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁরা পদচারণ করেছেন, নৃত্য করেছেন, কীর্তন করেছেন, ক্রীড়া করেছেন এই দিব্য ভূমিতে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই দিব্য ভূমি এখন অবনমনের দৃশ্য দেখছে। শাস্ত্র বলেছে, কলিযুগে, যে যুগে বর্তমানে আমরা বাস করছি, অধর্ম প্রসিদ্ধি লাভ করবে। সুতরাং এটি কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে, ভারতবর্ষ যার মূল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা তারই আজ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের অবনমন দেখতে শুরু করবে।

যেহেতু সমাজ আভ্যন্তরীণ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে তাই বহির্শত্রুর আক্রমণ শুরু হবে এবং দেশের ধনসম্পদ লুঠ করবে। হাজার হাজার মন্দির অপবিত্র হবে এবং হাজার হাজার মানুষ নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

যদিও মানুষ তার নিত্য কর্ম এবং আধ্যাত্মিক আচরণে নিযুক্ত থাকবে কিন্তু তাদের হৃদয় সর্বদা নির্যাতন, নিপীড়নের ভয়ে কুঁকড়ে থাকবে। এটা শুধুমাত্র এই নয় যে মানুষ বহির্শত্রুদেরকেই ভয় করবে, এমনকি তারা ব্রাহ্মণদেরকেও যারা মানুষের ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দেয় তাদের দ্বারা শোধিত হওয়ার ভয়েও ভীত থাকবে।

ধর্মীয় আচরণ যা একজনের চেতনা বিকশিত করে এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার পশ্চাদপসারণ হবে। ধর্মীয় আচার আচরণ যা বেদের সার তার পরিবর্তে অধর্ম প্রসিদ্ধি লাভ করবে। পশু বলিদান বিপুল মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। মানুষ পূর্ণরূপে জড়বাদীতে রূপান্তরিত হবে।

এক বৈপ্লবিক সংস্কারক আবির্ভূত হলেন ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঠিক সেই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ভারতবর্ষ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্যায় জর্জরিত। তিনি ১৪৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপধামের মায়াপুরে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর শিক্ষা এবং জীবন শৈলীর মাধ্যমে এককভাবে পুরোহিত প্রথার একাধিপত্য, ব্রাহ্মণগণ যারা তীব্ররূপে কঠোর জাতিপ্রথার প্রবর্তন করে মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন তা সমাপ্ত করেন। ব্রাহ্মণ জাতি ধর্ম অনুসারে তারা সাধারণ মানুষের জন্য বিগ্রহ পূজা, বৈদিক গ্রন্থ অধ্যয়ন, বৈদিক ক্রিয়া কর্ম, মন্ত্র জপ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তারা আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা ভগবানের ভাগ্যবান প্রতিনিধি এবং শুধুমাত্র তাদের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে।

শাস্ত্র কখনো অন্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কথা বলেনি। বেদে বর্ণিত সামাজিক বিভাগের অর্থ হচ্ছে সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতি। বিভাগ জন্ম অনুসারে নয়, কর্ম অনুসারে নির্ধারিত হয়। (গীতা ৪/১৩) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা সমুহকে পুনঃস্থাপন করার জন্য এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অনৈতিক জাতিগত প্রথার শৃঙ্খলকে মোচন করে প্রত্যেককে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা অভ্যাসের সুযোগ প্রদান করতে।

সংকীর্তন আন্দোলনের জন্ম ঃ

তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের সমবেত জপ এবং তার প্রচার। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত (১২ ৩ ৫১) উদ্ধৃত করে বলেন, জপই হচ্ছে একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা যার মাধ্যমে একজন এই কলিযুগে উদ্ধার লাভ করতে পারে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কোন নুতন মন্ত্র নয়। জপও কোন নতুন পদ্ধতি নয়। প্রকৃতপক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনন্তকাল ব্যাপী চলে আসছে এবং শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই নয়। সমস্ত উর্ধ্ব লোকেই এই মহামন্ত্র জপের প্রথা বর্তমান। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মানুষ তা বিস্মৃত হয়েছে এবং নিজেদেরকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। জপ এককভাবে করা যায়, আবার অনেকের সঙ্গেও করা যায়। তখন সেটি সমবেত জপে পরিণত হয়।

প্রত্যেকেই ভগবানের দিব্য নাম জপে যোগ্য। তথাকথিত উচ্চ-নীচ জাতি, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, প্রত্যেকেই এই জপে স্বাগত। এই জপের মাধ্যমে তারা জীবনে প্রথম বার ভগবানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অনুভব করতে পারবে। হাজার হাজার মানুষ জপ আরম্ভ করেছে। নবদ্বীপের প্রতিটি ঘরে ঘরে যে কেউ ভগবানের দিব্য নাম জপের শব্দ শ্রবণ করতে পারবেন। এটি দাবানলের ন্যায় বিস্তার লাভ করে।

এই দাবানল ব্রাহ্মণ সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায়ের একনায়কতন্ত্রকে বিনাশ করতে শুরু করেছিল। মুসলিম শাসকগণ ভীত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, সংযুক্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাদেরকে পরাভূত করতে পারে। বহু অ-হিন্দুদেরও এই সমবেত জপে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাদের উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মুসলিম শাসকদের নিকট প্রস্তাব পেশ করলেন। তারা উভয়েই এই সংকীর্তন আন্দোলনকে স্তব্ধ করার পরিকল্পনা করলেন। তদানীন্তন নবদ্বীপের শাসক চাঁদ কাজী এক আদেশনামা জারি করলেন। ‘‘অবিলম্বে কীর্তন বন্ধ করতে হবে। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে তাহলে তার কঠিন শাস্তি হবে’’ কাজীর সৈন্যগণ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়ে এই আদেশনামা ঘোষণা করে আসলেন। শ্রীবাস ঠাকুর যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক বিশেষ অনুগামী তাঁর গৃহে এমন কি একটি মৃদঙ্গও ভেঙে ফেলা হলো। সাধারণ মানুষজন যারা ভগবানের এই দিব্য নাম কীর্তনের আনন্দে বিভোর ছিলেন তারা বিষন্ন হয়ে পড়লেন। তাদের ধর্মাচরণের সীমিত স্বাধীনতাটকুও হরণ করা হলো। তখন তাদের নিকট মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল। বাঁচতে হলে কীর্তন ত্যাগ করতে হবে অথবা কীর্তন করতে হলে জীবন ত্যাগ করতে হবে।

হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে উত্তাল এবং পথে ঃ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের নেতা, তাদের পবিত্রতা। তাঁর নিকট তারা প্রস্তাব রাখলেন। যিনি পবিত্র বেদের শিক্ষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁকে বেদের অনুগামীদের প্রাণ রক্ষা করতে হবে। ‘‘ভগবানের দিব্য নাম জপকে স্তব্ধ করার ক্ষমতা কারোর নেই, আমরা কাউকে ভয় পাবো না। আমরা এই বৈষম্যমূলক আদেশ অমান্য করবো।’’ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উদাত্ত আহ্বান সকলের মনে এক

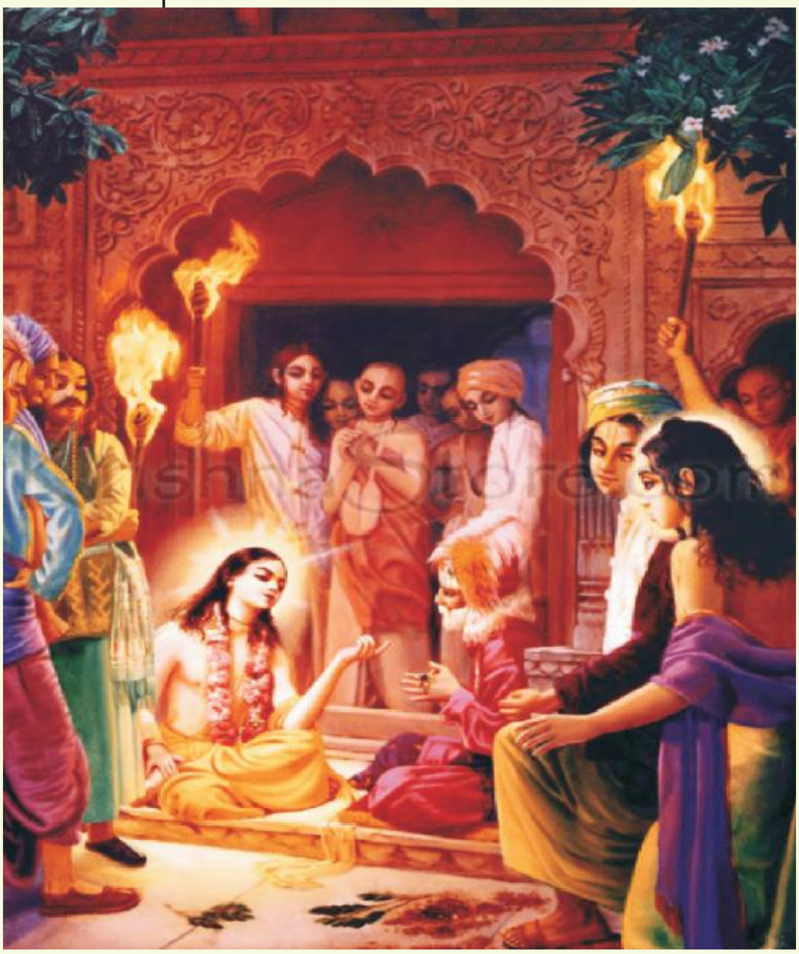

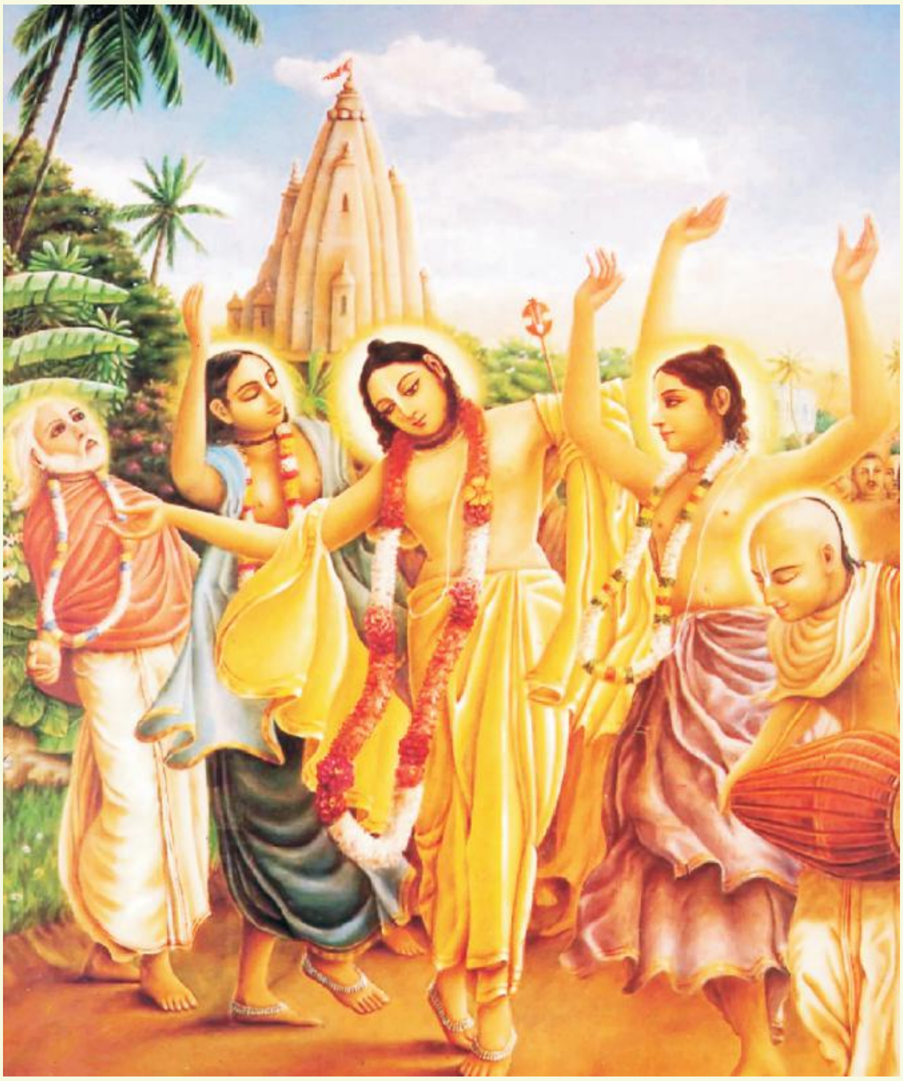

বৃহৎ আশার সঞ্চার করল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাজার হাজার অনুগামীদের নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। শতবৎসর পূর্বে গান্ধীজি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য যা এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এক লক্ষ মানুষ মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে নবদ্বীপের সমগ্র আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে ফেলল। সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজীর গৃহের অভিমুখে গমন করলেন। শক্তিশালী সৈন্যদল অসহায় ছিল, তারা ভীত হয়ে পলায়ন করল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাজীর আদেশনামার বিরোধিতা করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় একমাইল প্রমাণ দীর্ঘ অতিকায় জন-সমুদ্র দেখে কাজী ভয়ে তার রাজমহলের অন্তঃকক্ষে লুক্কায়িত হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাইরে এলেন। এই অনৈতিক আইনের ওপর তার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো।

মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেননি। তিনি সেখানে তার ক্ষতিসাধন করতে যাননি। তিনি কাজীর সঙ্গে যুক্তি এবং বিনয়ের সঙ্গে বার্তালাপ করলেন। তাঁর দেওয়া যুক্তিতর্ক অকাট্য ছিল। কাজী তার ভুল অনুধাবন করতে পারলেন, তার হৃদয় তখন পরিবর্তিত হলো। অশ্রুসজল নয়নে তিনি তখন বললেন, "আজ থেকে ভবিষ্যতে আমার বংশধরদের প্রতি আমার কঠোর নির্দেশ ঃ সংকীর্তন আন্দোলনকে কেউ বাধা দান করতে পারবে না।" চৈ.চ. শ্লোক ২২২। ভক্তরা উল্লসিত ছিল। এখন তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে স্বাধীন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে বেদে, শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২), মহাভারতে, আদিপুরাণে, নারদীয় পুরাণে, পদ্মপুরাণে একজন বৈপ্লবিক সমাজ সংস্কারক হিসাবে আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী বর্তমান। তিনি বিশ্বব্যাপী সংকীর্তন আন্দোলনের প্রণেতা। যে আন্দোলন তিনি নবদ্বীপে সূচনা করেছিলেন আজ তা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।

তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আগমন করেছিলেন যে, আমরা একই ভগবানের সন্তান সুতরাং সেখানে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ অথবা আর্থিক অবস্থার বৈষম্য কারোর ওপর আরোপ করা উচিত নয়। তাই আমরা অন্বেষীদের কৃষ্ণভাবনামৃত নির্ভয়ে অভ্যাস করা উচিত এই বিশ্বাসের সঙ্গে যে, যেকোন কঠিন অবস্থাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অবশ্য রক্ষা করবেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের প্রথম মিলন

- গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

গৌরাঙ্গ চম্পূ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে,—মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন, একখানি তালধ্বজ রথ আমার গৃহ দ্বারে এসে উপস্থিত হলো। তাঁর অবয়ব সকল স্বর্ণ ও নানা রত্নে চিত্রিত। তথায় একজন নরশ্রেষ্ঠ বিরাজমান ছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তিতে চারদিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করছিলেন এই স্থানে কি শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের বাড়ি? মহাপ্রভুর এই স্বপ্ন দর্শনের বিবরণ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা রয়েছে—

তালধ্বজ একরথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার।।
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির।।
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান, নীল বস্ত্র মাথে।।
বাম শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝি সে চরিত্র।।
এই বাড়ি নিমাঞি পণ্ডিতের কি হয়?
দশ বার বিশ বার এই কথা কয়।।
মহা অবধূত বেশ, পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাই দেখি এমন উদ্দণ্ড।।
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিলাম আমি,কোন মহাজন তুমি।।
হাসিয়া আমারে বলে, এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়।।

স্বপ্নে মহাপ্রভু বলদেবকেই দর্শন করেছিলেন; তাঁর সাথেই কথা বলেছিলেন। বলদেবের বৃত্তান্ত বলতে বলতে মহাপ্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হয়ে কিছু সময় ঐ ভাবে লীলাভিনয় করলেন।

মহাপ্রভুর স্বপ্ন বৃত্তান্ত নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—

প্রভু বিশ্বম্ভর প্রিয় পরিকর
প্রতি কহে শুন স্বপন কথা।
কিবা সে নির্মিত অতি সুশোভিত
তালধ্বজ রথ আইল এথা।
দেখিনু সুন্দর দীর্ঘ কলেবর
পুরুষ এক কি উপমা তাহে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসূত হৈল সেই।
বলরাম হইল নিতাই।।

যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত নিত্যানন্দ প্রভুও নবদ্বীপে আগমন করেননি। তিনি তখন ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এসে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করলেন। হরিনাম মহা সংকীর্তনের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হলো। সেই সংকীর্তনের প্রতিধ্বনি অতি শীঘ্রই বৃন্দাবনে এসে পৌঁছাল। তখন তিনি আর বিলম্ব না করে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এক কর্ণে কিবা　কুণ্ডল সে গ্রীবা
কিবা মুখশশী ভুবন মোহে।।
কাল কুম্ভ হাতে　নীল বস্ত্র সাথে
নীল বাস পরিধান সুছান্দে।
চৌদিকে নেহালে　হেলি দুলি চলে
সে ভঙ্গিতে কেবা ধৈরয বান্ধে।।
মোর নাম ধরি　পুছে বেরি বেরি
বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত করি নর　হরি প্রভুবর
বলরামভাবে বিহ্বল হৈলা।।

মহাপ্রভু নিজভাব প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন—আজ অনেক শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে নবদ্বীপে কোন মহাপুরুষের শুভ আগমন ঘটেছে। তিনি তখন শ্রীবাস ও হরিদাস ঠাকুরকে সেই মহাপুরুষকে খুঁজে আনার জন্য পাঠালেন। শ্রীবাস ও হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে তিন প্রহর যাবৎ খুঁজলেন কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা না পেয়ে মহাপ্রভুর নিকটে এসে তা জানালেন। মহাপ্রভু বললেন, তোমরা যে সেই মহাপুরুষের দেখা পাওনি, তা আশ্চর্য নহে। কারণ মহাপ্রভাবশালী পুরুষশ্রেষ্ঠগণ যোগী সকলেরও সহজে দর্শন যোগ্য নহেন। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমরা সকলে তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করব। একথা বলে সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু নন্দন আচার্যের গৃহে গমন করে তথায় নিত্যানন্দ প্রভুকে নয়নগোচর করলেন।

এই স্থানটি হচ্ছে মায়াপুর ঘাট থেকে ইসকন মন্দিরে যাওয়ার পথে রাস্তার ডান দিকে। নন্দন আচার্যের গৃহ, গৌর-নিত্যানন্দের মিলন স্থান। অপূর্ব গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন। অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীগৌর চন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে নিজের প্রাণের ঈশ্বর বলে বুঝতে পেরে তন্ময় হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল যেন শ্রীনিত্যানন্দ জিহ্বা দ্বারা গৌরচন্দ্রের অঙ্গলেহন করছেন। নয়ন দ্বারা যেন তাঁর রূপ সুধা পান করছেন। স্বীয় বাহু দ্বারা যেন গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন রছেন; নাসিকা দ্বারা যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের অঙ্গের ঘ্রাণ গ্রহণ করছেন। এভাবে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করে বিচার করতে লাগলেন—আহো! আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি কিন্তু এরূপ সৌন্দর্যের আধার কোন মানুষ দেখিনি। এঁর অঙ্গ সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত করে পুনরায় প্রচুর পরিমানে সুবর্ণ রসে প্রলেপ দিয়ে তার ওপর আবার বিদ্যুৎ পুঞ্জের দ্বারা উত্তম রূপে মার্জন করেছেন। অন্যথা এ প্রকার প্রভা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ভূষণ এঁর তনুখানি। তনুর ভূষণ বদন কমল, বদনকমলের ভূষণ নেত্র নামক পদ্মযুগল, নেত্রদ্বয়ের ভূষণ এঁর ভঙ্গিযুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টি। আমার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি ইনি? অন্যথা আমার মন কেন এর প্রতি আকৃষ্ট হবে? সূর্য ব্যতীত পদ্ম কি অন্য কোন বস্তুতে আসক্ত হয়ে থাকে? এই ব্রাহ্মণ যদি আমার ইষ্টদেব সেই ব্রজরাজ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

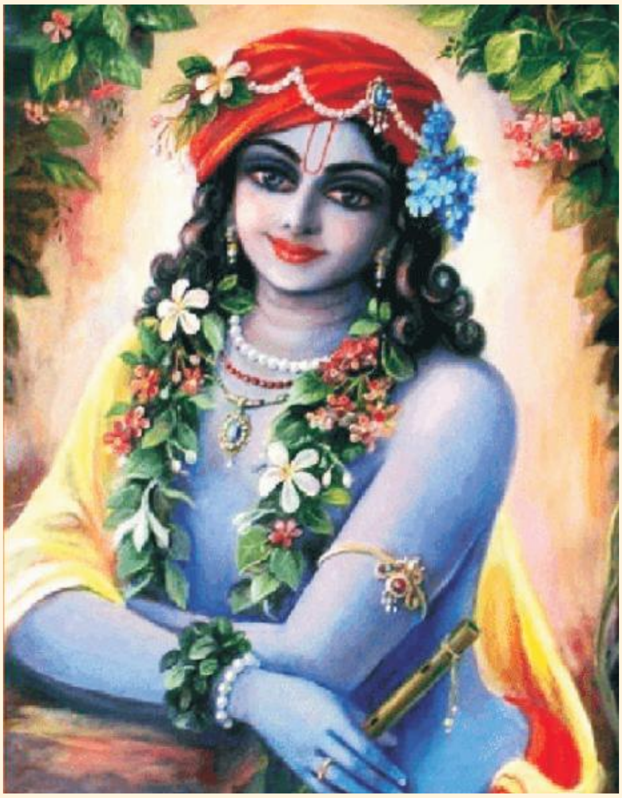

হয়ে থাকেন তবে কেন শ্যামবর্ণ আচ্ছাদন করে সুবর্ণ কান্তি হয়েছেন এটাই বিচার্য বিষয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন এভাবে বিচার করছেন তখন মহাপ্রভু এবং অন্যান্য সকলে তাঁকে বন্দনা করলেন। তিনি যখন তাঁদের সম্ভাষণ করলেন না। তখন গৌরচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, পণ্ডিতবর শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাময় একটি শ্লোক পাঠ কর। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/২১/৫ শ্লোকটি কীর্তন করেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রাদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ।।

নটবর বপু শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ময়ূর পুচ্ছে রচিত চূড়া, কর্ণ যুগলে কর্ণিকার অর্থাৎ উৎপলাকৃতি কুসুম, পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীতবসন এবং গলদেশে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরচিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে স্বীয় অধর সুধায় বেণুর ছিদ্র সমূহকে পরিপূর্ণ করতে করতে স্বীয় চরণ দ্বারা শোভিত বলে সকলের আনন্দজনক বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গের গোপবৃন্দ তখন তাঁর যশোগান করতে লাগলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও বর্ণনা রয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা শ্রবণ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরীরে প্রেমের বিকার দেখা দিল।

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন।।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
পড় পড় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।।
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়ায় উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

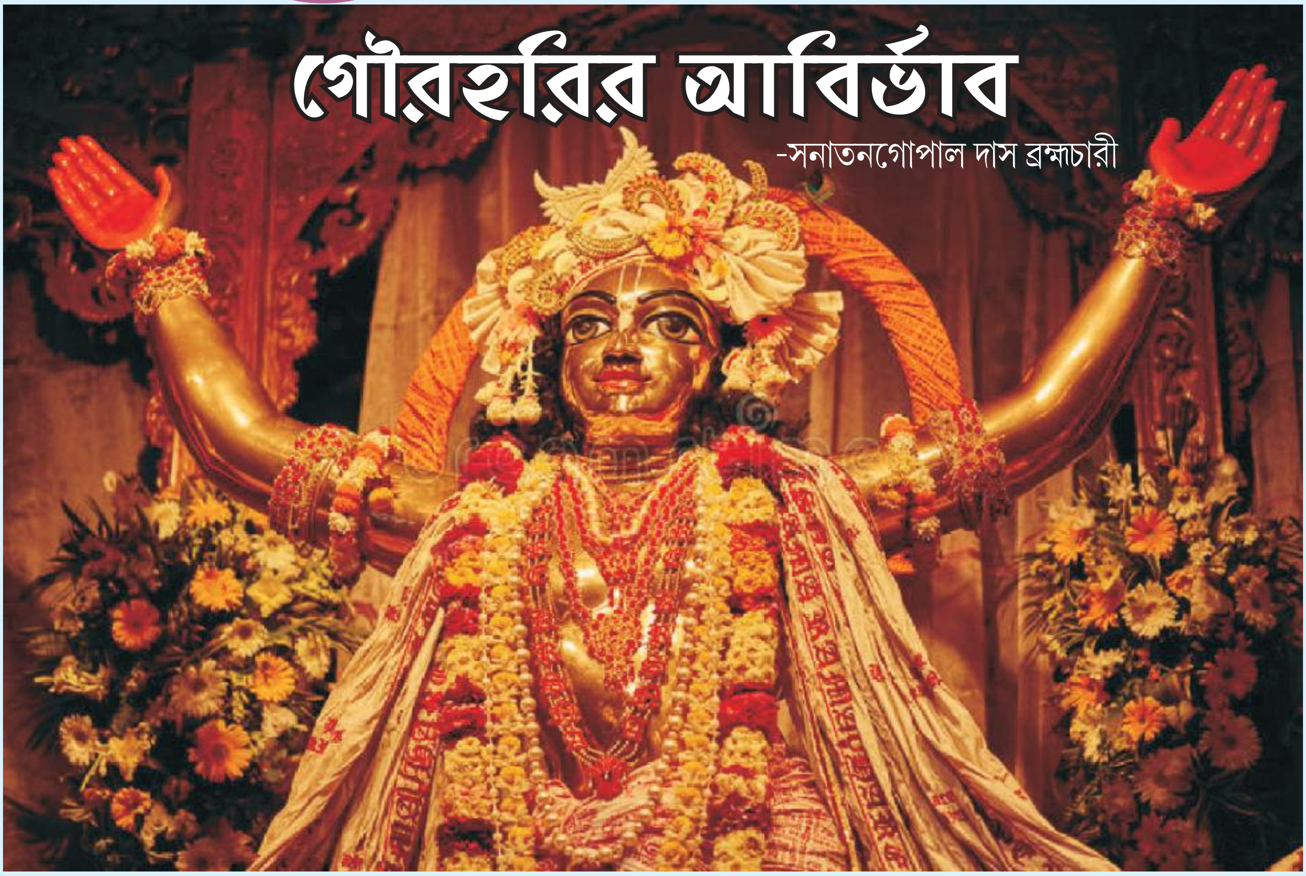

গৌরহরির আবির্ভাব

-সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই শুভ তিথি শুদ্ধসত্ত্বময়ী সাক্ষাদ্ ভক্তি স্বরূপিনী। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীগৌরহরিরূপে এই তিথিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে জগতকে ধন্য করেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ এই শ্রীচৈতন্য জন্মতিথির আরাধনা করে থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।।
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিনী।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা গৌরদ্বিজমণি।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩/ ৪৩-৪৪)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আরও বলা হয়েছে—

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।।
সর্ব-যাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইতি।।
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩/৪৫-৪৭)

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমার সেবা করলে বদ্ধ জীবের অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। উপবাস ও মহোৎসবের মাধ্যমে এই দুই ভগবৎ তিথির সেবা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ জগতে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রচার করে বদ্ধ জীবকে উদ্ধারের পন্থা শিখিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের ছলে হরিসংকীর্তন প্রচার করে সংকীর্তন মাঝে জগতে অবতীর্ণ হলেন। সেই সময়ে এমনকি যারা জন্মেও কোনদিন ভুল করে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করেনি, তারাও সেই দিন হরিধ্বনি করতে করতে গঙ্গাস্নানে ধাবিত হলো।

যার মুখ জন্মেহ না বলে হরিনাম।
সেই 'হরি' বলি ধায়, করি গঙ্গাস্নান।।
দশ দিক পূর্ণ হৈল, উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩/৪-৫)

গৌরমাতা শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন মহান জ্যোতিষী। তিনি শিশু গৌরাঙ্গের জন্ম-লগ্ন বিচার করে শিশুর সর্বোত্তম মহিমা সবার সামনে বলতে লাগলেন।

বিপ্র বলে, এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইঁহা হৈতে সর্ব-ধর্ম হইবে স্থাপন।।
ইঁহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব-জগৎ উদ্ধার।।
ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব জন।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩/ ১৬-১৮)

ব্রহ্মা, শিব, শুকদেব প্রমুখ মহাপুরুষগণ যা লাভ করতে সর্বক্ষণ ইচ্ছা করে, এই শিশু তা সকল লোকের সহজলভ্য করবে। এই বালক সর্বপ্রাণীতে দয়ার্দ্র হবে, সুখে দুঃখে নিরপেক্ষ থাকবে।

গণনা বিচার করে তিনি আরও বলেন, জগতের সকল লোক চৈতন্যরসবিগ্রহ গৌরকৃষ্ণে প্রীতি লাভ করবে। সর্ব প্রাণীতে দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সুখে দুঃখে নিরপেক্ষ থাকবেন। যবন, বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তিরাও অভক্তি বর্জন করে শ্রীগৌরহরির অনুগমন করবে।

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩ /২০)

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এ শিশুর গুণগান করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই এই বালককে প্রণতি নিবেদন করবে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্তি গাহিব ইহান।
আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩ /২১)

এ শিশুর নাম হবে বিশ্বম্ভর বা বিশ্বের ভরণপোষণকারী। কিন্তু গৌরহরি যে সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন সেই কথাটি স্নেহ সিক্ত হৃদয় মাতা-পিতার কাছে গোপন রাখলেন। প্রকাশ করলেন না।

এভাবে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী বালকের শুভ লক্ষণ বর্ণনা করতে করতে বালকের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে তাঁর পরম সুকৃতির জন্য প্রণাম জানালেন, এবং তিনি নিজে প্রভুর জন্মকোষ্ঠী গণনা করার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করলেন। শিশুপুত্রের আখ্যান শুনে জগন্নাথ মিশ্র জ্যোতিষী বিপ্রের চরণ ধরে আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। চতুর্দিকে তখন উপস্থিত লোকজন আত্মীয়বর্গ আনন্দে ‘হরি হরি’ ধ্বনি করতে লাগলেন।

তারপর থেকে অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখা গেল। বহু বাদ্যকারের বাদ্যধ্বনি শুরু হলো। কারা যে বাজাচ্ছে, কারা যে নাচছে, কারা যে গান করছে। অনিমন্ত্রিত অপরিচিত ব্যক্তিরা সবাই এসেছে। স্বর্গলোকের দেবীগণ মানবী রূপ ধারণ করে শিশুকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন। দেবমাতা অদিতি ধান-দূর্বা শিশুর মস্তকে স্থাপন করে প্রফুল্ল চিত্তে ‘চিরায়ু হও’ বলে আশীর্বাদ করলেন। মা শচীদেবী দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী মেয়েরা কারা সব এসেছে। তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতেও শচীমাতা সঙ্কুচিত হচ্ছেন। সেই দেবীগণ শচীমাতার পাদপদ্মধূলি নিতে লাগলেন। এইভাবে শচীগৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ হলো। শুধু শচীগৃহ নয়, সারা নদীয়ায় নিরবধি মহানন্দে হরিধ্বনি উঠতে লাগল।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মলীলা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তিফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে।।
(চৈঃ ভাঃ আ ৩ /৪৯-৫০)

বীরবলের একটি পরীক্ষা

কৃষ্ণকপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প হতে সংগৃহীত

উপদেশ : **প্রত্যেকেই নেতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাই নেতাকে দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রের হওয়া উচিত।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবামৃতের কার্যাবলী

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বরিস জনসন হঠাৎ ভক্তিবেদান্ত ম্যানোর পরিদর্শন করলেন

রাধা মোহন দাস ঃ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বরিস জনসন ডিসেম্বরের এক রবিবার হঠাৎ ভক্তিবেদান্ত ম্যানোর পরিদর্শনে যান। ম্যানোরের উপাসকেরা সপার্ষদ সাংসদগণ, গৃহসচিব প্রীতিপ্যাটেল, অনেক সুরক্ষা কর্মী পরিবারের সদস্যদের আরাধনায় অংশগ্রহণ করতে দেখে তিনি বিস্মিত হন প্রীতি প্যাটেল ওয়াটফোর্ড স্কুলে যান এবং তাঁর পরিবার হার্টফোর্ড শায়ারে বসবাস করেন।

প্রধানমন্ত্রীকে দশ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত এবং প্রায় সমাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ হাভেলী যা বহুবিধ সুবিধা সম্পন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা প্রথাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। তৎপশ্চাৎ সমবেত ভক্তগণ, প্রতিবেশীর, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সুন্দর মন্দির কক্ষ মূল মক-টুডোর ম্যানসনে নিয়ে যান যা স্বর্গীয় বিটেল জর্জ হ্যারিসন দান করেছেন।

বিখ্যাত শ্রীবিগ্রহের আনুষ্ঠানিক কৃপা প্রাপ্তির পর উপস্থিত ভক্তগণ এবং অতিথিগণের উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং এর মূল্যবোধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

"আমি এই মন্দিরের এবং সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে অভিভূত। এটি অবশ্যই শুধুমাত্র বৃহৎ আধ্যাত্মিকতার স্থান নয়, এটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেন যে, যখন মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে তিনি পুনরায় আসবেন।

উপহার সামগ্রী এবং মন্দিরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন দেবার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্দির গোষ্ঠীতে গাভীদের খাদ্য প্রদান করেন। গাভী এবং বলদকে খাদ্য দান হিন্দুধর্মের এক পবিত্র রীতি যেখানে সমস্ত প্রাণীকে গভীর শ্রদ্ধা করা হয়।

মন্দির সম্প্রচার প্রধান বিনয় তান্না বলেন, "ভক্তিবেদান্ত ম্যানোর হচ্ছে আরাধনা স্থল এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান। এটি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের অধিভুক্ত নয়, যদিও আমরা এখানে আগত সমস্ত দর্শনার্থীগণকে সর্বদাই গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।"

ভক্তরা হরিয়ানা ও চণ্ডীগড় কারাগারের বসবাসকারীদের উন্নতি সাধন করলো

ইসকন নিউস ঃ ইসকনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্যের কৃপা কলিযুগের অধম পতিত জড়জাগতিক কারাগারে চির আবদ্ধ জীবাত্মাদের মধ্যে বিতরণ করা।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) চণ্ডীগড় বিভিন্ন কারাগারে যথা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং হিমাচল প্রদেশে বসবাসকারীদের চেতনার উন্মেষ ঘটাতে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করছে।

কারাগারে বসবাসকারীদের আচরণে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ইন্ধন জাগিয়ে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের চেষ্টায় রত প্রঘোষ দাস, অকিঞ্চন প্রিয় দাস, অক্রুরানন্দ দাস, হয়গ্রীব দাস, গৌরাঙ্গ গোপাল দাস এবং গঙ্গাপ্রিয় দাস ইসকন চণ্ডীগড় থেকে

চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রীয় কারাগার এবং আদর্শ কারাগার আম্বালা (হরিয়ানা) পরিদর্শন করেন।

৮০০ কপি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ কারাগারে বসবাসকারী এবং আধিকারিকদের মধ্যে বিতরণ ছাড়াও তারা বৈদিক বিধি অনুযায়ী প্রাত্যহিক জীবন যাপনের গুরুত্বের ওপর আধ্যাত্মিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সুরেলা হরিনাম সংকীর্তন সকলকে মোহিত করেছিল।

ভুবন বিখ্যাত প্রচারক ত্রিভুবনাথ দাসের স্মরণ উৎসব

মাধব দাস ঃ ১৬ই নভেম্বর লণ্ডনের ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের এক সফলতম যোদ্ধা ত্রিভুবনাথ দাস যিনি ইসকন সদস্যদের সঙ্গে অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন তারা স্মরণ উৎসব পালন করলেন। তিনি ২০০১ সালে অপ্রকট হন।

স্মরণ উৎসবটি ত্রিভুবনাথের আবির্ভাব দিবসের সম্মান জ্ঞাপনে পালিত হয়, যে দিবসটি পাশ্চাত্য সূর্য পঞ্জী অনুযায়ী ২৭শে নভেম্বর এবং বৈদিক চন্দ্র পঞ্জী অনুযায়ী গীতা জয়ন্তীর দিন।

হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যা ত্রিভুবনাথের প্রিয় কর্মকাণ্ড ছিল, বহু ভক্ত তাদের জীবনের অনেক স্মৃতি বিনিময় করেন।

ভক্তদের মধ্যে তাকে অচিরেই আদরনীয় করে তোলে। মাত্র সতের বছর বয়সেই লণ্ডনের বারি প্লেস মন্দিরের অধ্যক্ষ বানানো হয় এবং তিনি হন ইসকনের কনিষ্ঠতম মন্দির সভাপতি।

ত্রিভুবনাথ এডিনবার্গ ও স্কটল্যাণ্ডে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমগ্র যুক্তরাজ্য জুড়ে বৃহৎ বৃহৎ হরেকৃষ্ণ প্রচার উৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭২ সালে গ্লাসগোতে উডসাইড প্রেক্ষাগৃহে এমনই এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। গিরিধারী স্মরণ করেন যে, ত্রিভুবনাথ তাকে বলেছিলেন, অনুষ্ঠান শেষে শ্রীল প্রভুপাদ মঞ্চ থেকে নেমে এসে প্রেক্ষাগৃহের পিছনে যেখানে ত্রিভুবনাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে যান, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘তুমি যা করেছো তার জন্য আমি অতিশয় সন্তুষ্ট’’।

তার সময়ে তার দলের ভক্তদের সর্বদাই কিছু করতে বলা হতো। তারপর শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদল হতো, অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করতে বলা হতো অথবা নতুন সেবা সম্পাদন করতে বলা হতো। এই ধরনের স্বতঃস্ফুর্ততা তাকে বিরক্ত করত। ছন্দা দেবী দাসী ত্রিভুবনাথ দাসের এক সমর্পিত প্রাণ সৈনিক প্রতিক্রিয়া দিলেন—আপনি যদি কাউকে ভালবাসেন তাহলে তার সব কিছু করতে পারেন। ত্রিভুবনাথ এইভাবে তার প্রত্যেক সৈন্যকে ভালবাসতেন এবং তার এই গুণই তাকে মহান করে তোলে।

বৃহৎ সুড়ঙ্গ শীতের মাসগুলিতে নববৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহের জন্য ফুল এবং সবজি উৎপাদন করবে

ইসকন নিউজ ঃ পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে প্রথম তুষারপাত শুরু হলে তা বসন্তের শেষ পর্যন্ত চলতে পারে যা অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত সমস্ত ঋতুকালীন উৎপাদন স্তব্ধ করে দেয়।

কিন্তু ইসকন নববৃন্দাবনের প্রথ ফার্ম সম্প্রদায়ের (১৯৬৮ সালে স্থাপিত) ভক্তরা শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য তিনটি বৃহৎ গ্রীন হাউস সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেছে যা থেকে

উৎপাদিত স্থানীয় শাক-সবজি এবং ফল শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির এবং ভোগ মন্দিরে সারা বছর সরবরাহ করা হবে।

বৃহৎ সুড়ঙ্গগুলি ধাতব স্তম্ভ দ্বারা তৈরী যার মধ্যে দ্বিস্তরীয় প্লাস্টিক আবরণ বর্তমান এবং সেখানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। তাপস্থাপক দ্বারা তাপমাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে। সুড়ঙ্গের দুই প্রান্ত ওপর নীচ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন।

এই বৃহৎ সুড়ঙ্গগুলিতে ঋতুকালীন সময়ের ছয় সপ্তাহ পূর্বে অথবা ছয় সপ্তাহ পর পর্যন্ত সমগ্র শীতকাল ব্যাপী ঘন সবুজ ফসল উৎপাদিত হবে। অনলক্ষিতা দাসী এবং বিদ্যা বলেন, ‘‘আমরা সর্বদাই ফসল রোপণ এবং কাটাই’’ সমগ্র বৎসর ব্যাপী করছি।

তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাস সকলেই প্রায় বাগান শেষ করে ফেলেছে’’, ‘‘কিন্তু আমরা এখনো বীট, গাজর, লেটুস, মুলো কাটছি এবং সদ্য পালংশাক বপন করেছি। আমরা শ্রীবিগ্রহের জন্য বহু সুগন্ধী ফুল রোপণ করেছি যথা ড্যাফোডিল, জায়াসিনথ্, টিউলিপ ইত্যাদি। এবং গত মাস পর্যন্ত রজনীগন্ধা সংগ্রহ করেছি।

এটা ঘটনা যে, এই শীতে তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রী ফারেনহাইটের (,১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) নীচে নেমে গেছে।

যদিও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে উৎপাদন হ্রাস পাবে, ভক্তরা তাই বসন্তকালীন কার্য মার্চ মাসের শুরুতেই রোপণে আশাবাদী, যেখানে সবুজ বীন, মটর, গাজর বীট এমনকি টম্যাটোও রোপণ করা হবে।

অনলক্ষিতা বলেন, ‘‘প্রত্যেকের তুলনায় আমরা উৎপাদন ঋতু অনুযায়ী কয়েক মাস এগিয়ে থাকবো। আমরা প্রথমে সংগ্রহ করব।’’

এই বৃহৎ সুড়ঙ্গগুলি অমরসুসে মন্দিরকে ভাণ্ডার থেকে অল্প থেকে অতি অল্প বস্তু সংগ্রহে সহায়তা করবে কারণ এখানে অধিক উত্তম গুণসম্পন্ন স্থানীয় খাদ্য বস্তু উৎপাদন করা হবে যা দামী ফুল সংগ্রহে অনেক অর্থ সাশ্রয় করবে।

রনকা বলেন, ‘‘আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অধিক থেকে অধিকতর প্রায় সমস্ত বস্তু শ্রীবিগ্রহ এবং মন্দির আবাসিক ভক্তগণের জন্য উৎপাদন করা।’’

গীতা জয়ন্তী—পরমজ্ঞান প্রকাশিত হলো

মায়াপুর কমিউনিকেশনস ঃ ৫২৪৪ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রে রনাঙ্গনে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি গুহ্য এবং পরম জ্ঞান যোদ্ধা রাজপুত্র অর্জুন এবং বৃহৎ রূপে মানবতার প্রতি প্রদান করেছিলেন যাতে ভক্তদের এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়ার পন্থা অনুধাবনে সহায়তা হয়। প্রতি বৎসর এই বাৎসরিক উৎসবের দিনটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা সমবেত হয়ে গীতা পাঠ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমির প্রায় ৭০০ ছাত্র এক বৃহৎ গীতা জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। তারা মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করেন, উৎসব প্যাণ্ডেলে যাবার আগে গঙ্গা স্নান করেন। একটি সুন্দর সুসজ্জিত যজ্ঞ কুণ্ড তৈরী করা হয় এবং ভগবদ্গীতার সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয়। গড়ে প্রায় চার হাজার ভক্ত মিলিতভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করার জন্য একত্রিত হন। আবহাওয়াটি ছিল ভাব গম্ভীর। গীতা পাঠের পর সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

ভক্তরা পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসব পালন করেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিভিন্ন সন্ন্যাসীগণ, বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারীগণ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ গীতা শিক্ষার উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করেন। মধ্যেকার সময়গুলিতে তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন পরিক্রমা, তাৎক্ষণিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন।

এই বছর ছিল ২৩তম বর্ষপূর্তি উৎসব। প্রথম শুরুর সময় মাত্র ২০ জন ভক্ত দিয়ে উৎসবটির সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এই বছর সমগ্র বিশ্ব থেকে প্রায় ২১০০ ভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। ভক্তরা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উপবাস করেন, গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করেন এবং সন্ধ্যা বেলায় হরিনাম সংকীর্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর আন্তর্জাতিক স্কুলে সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্ররা সমবেত হয়ে গীতা পাঠ করেন। এই রূপে শ্রীধাম মায়াপুরে সমস্ত কৃষ্ণভক্তরা পবিত্রতম গীতা জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে পালন করেন।

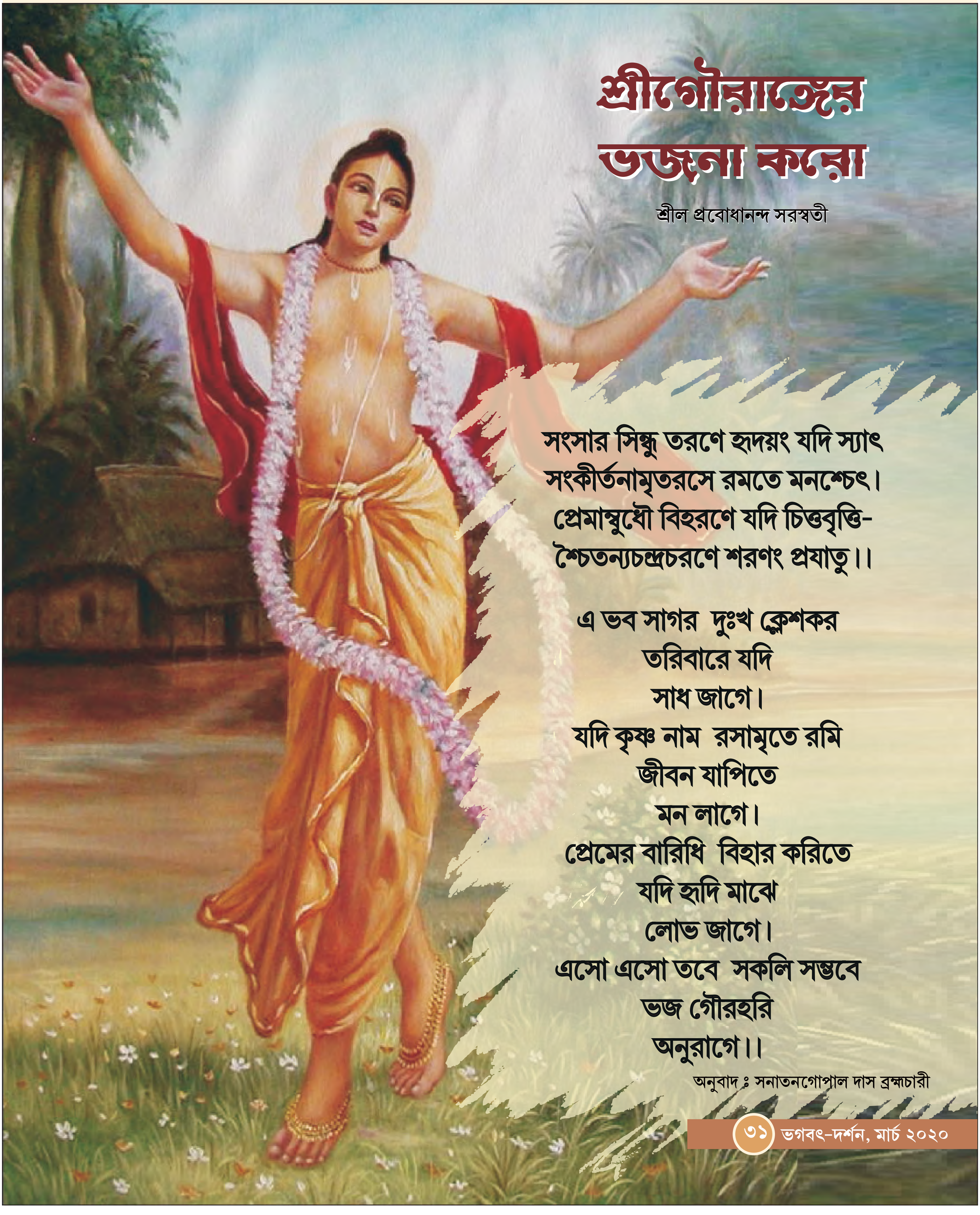

শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করো

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু।।

এ ভব সাগর দুঃখ ক্লেশকর
তরিবারে যদি
সাধ জাগে।
যদি কৃষ্ণ নাম রসামৃতে রমি
জীবন যাপিতে
মন লাগে।
প্রেমের বারিধি বিহার করিতে
যদি হৃদি মাঝে
লোভ জাগে।
এসো এসো তবে সকলি সম্ভবে
ভজ গৌরহরি
অনুরাগে।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

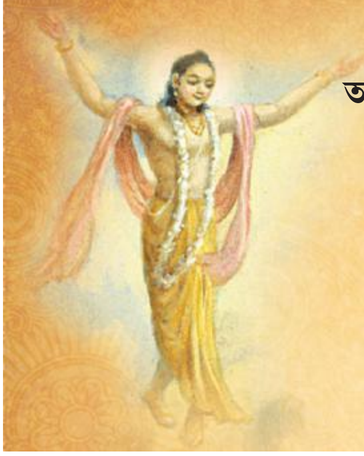

আপনার জীবনের পরম সত্যানুসন্ধানের একমাত্র সহায়ক

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা

১১টি ভাষায় প্রকাশিত ।। সমগ্র দেশব্যাপী ১.৫ লাখ পাঠক এবং তাঁদের পরিবার ।।

উপলব্ধি, ভক্তির আনন্দ, আত্মশক্তি, আত্মানুভূতি, আলোকপাত, আধ্যাত্মিকতা

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439

AXIS BANK (Kolkata Main Branch)

7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

ভগবৎ-দর্শন এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ।

যে সকল ভক্তগণ, প্রচার কেন্দ্র ও মন্দিরগুলি ভগবৎ-দর্শন পত্রিকা বিতরণ করতে উৎসাহী তাঁরা অতি অবশ্যই যোগাযোগ করুন।

আজই গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন

লগ-অন করুনঃ

www.bhagavatdarshan.in

Email : btgbengali@gmail.com

আপনার যোগাযোগের নম্বর

9073791237

বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

(সোম থেকে শনি)